সন্ধিক্ষণ

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য্য

বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী

O প্রথম প্রকাশ

১লা শ্রাবণ, ১৩৬৭

O প্রকাশক

শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী

২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

O মুদ্রক

জ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায়

পি, এম, বাগচী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

৩৮-এ, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৬

O প্রচ্ছদ

সুবোধ দাসগুপ্ত

দাম ঃ দুই টাকা

আমার মাকে

সন্ধিক্ষণ   যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

আবার বুঝি বৃষ্টি নামে।

কান পেতে বৃষ্টি পড়ার শব্দ শোনে সমীরণ। এ-ই করতে হবে এখন। উপায় নেই। বাইরে একটানা বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুনে শুনেই হয়তো রাতটা ভোর হবে। যেমন হয় অন্য দিন। আজও তাই হবে। সমীরণকে যেতে হবে না আর। যা বৃষ্টি!

ভেতরে কেউ আছে কি নেই, টের পাওয়া শক্ত। এমনি নিঝুম এই বাড়িটা। শত ডাকাডাকিতেও হয়তো ছুটে আসবে না কেউ। কিন্তু সমীরণের একটা ছাতার দরকার। বাড়ি যেতে হবে। এখান থেকে দু'মাইল পথ।

সেই কখন ভেতরে গেছে ইলা। আর ফেরেনি। কণিকা সেনও একবার এদিক পানে এলেন না। বাইরে দরজার কাছেই মোটরের আওয়াজ শোনা গিয়েছিল কিছুক্ষণ আগেও। এখন সব চুপ। তাহলে সেন সাহেবও ফিরে এসেছেন। তবে কি সবাই ঘুমিয়েছে ওরা। কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে। বাড়ির মাস্টারকে এমন একলা ঘরে বসিয়ে! এদের এই নিয়ম। বাইরের লোকের কাছ থেকে দূরে-দূরে সরে থাকার রেওয়াজ। কেমন যেন স্বভাব। সমীরণের অচেনা। একটু অস্বাভাবিক। অস্বস্তিকর ব্যবহার। সমীরণ লক্ষ্য করেছে এসব। একদিন না। দুদিন না আজ তিন মাস ধরে দেখছে সমীরণ। কণিকা সেনের মুখে হাসি নেই। সেন সাহেব মানুষটিও কেমন গম্ভীর। মনে হয় ভেতরে ভেতরে জ্বলছেন। রেগেই আছেন সর্বদা। মুখে কিন্তু কথা নেই। চেঁচিয়ে কথা বলে না ইলাও। প্রাণ খুলে হাসতে বুঝি ভীষণ ভয় ওর।

সমীরণের কিন্তু একটুও ভাল লাগে না এখানে। কিন্তু উপায় নেই। ছাড়তে পারে না। তিরিশ দিনে তিরিশটি টাকা। ছেড়ে দিলে কোথায় পাবে সমীরণ। যাবে কোথায়......

তিনমাস আগে গেছে। না গেছে এমন ঠাঁই নেই। কিন্তু তিনটি পয়সাও আসেনি হাতে। শুধু অপমান, অশ্রদ্ধা আর অবজ্ঞা কুড়িয়ে বেড়িয়েছে সর্বত্র।

সেই লোকটাকে মনে পড়ে। কাঁচরাপাড়ার সেই ভদ্রলোক। রেলের বড় অফিসার। কী ভট্টাচার্য যেন নাম। নামটা আর মনে নেই। কিন্তু তাঁর কথাগুলি কাঁটার মত বিঁধে আছে বুকে।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিল সমীরণ। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসেছিল লোকটা। পাগলা কুকুরের মত ক্ষেপে উঠেছিল সমীরণকে দেখে। 'হোয়াট'! চাকরি! চাকরি কি গাছের ফল? পেড়ে দেবো তোমাকে? আমার বাসায় আসতে বলেছে কে তোমায়।'

অবাক হয়ে গিয়েছে সমীরণ। কিছুই বলতে পারেনি আর। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল ভট্টাচার্য সাহেবের মুখের দিকে।

—'গেট আউট!' চিৎকার করে উঠেছিলেন ভট্টাচার্য সাহেব। 'তোমার জন্মের সময় কি এমন কোন কথা ছিল নাকি? আমিই তোমাকে চাকরি দেবো? ইডিয়ট কাঁহাকা!

জবাব এসেছিল মুখে। সমীরণ কথা বলতে পারেনি। কেবল রাগে অপমানে চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠেছিল। নড়ে উঠেছিল ঠোঁট দুটো। কিন্তু কথা বলার শক্তি ছিল না। মাথা নীচু করে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল সমীরণ। দু'হাতে মুখ লুকিয়ে কেঁদেছিল।

অভয় দিয়েছিলেন বিপদনাশিনী, 'এখনি কি ভেঙ্গে পড়লে চলে! বোকা! এই তো সবে শুরু। আবার চেষ্টা কর। ব্যবস্থা একটা হবেই।'

মায়ের উপর সেদিন রাগ হয়েছিল ভীষণ। ছেলের দুঃখ-কষ্ট অপমান কিছু না। বিপদনাশিনীর কাছে তাঁর স্বার্থই সবচেয়ে বড়। মাকে ভাল লাগেনি সমীরণের।

চাকরি। পাশ করার পর কম চেষ্টা করেনি সমীরণ। বার বছরের দরখাস্ত জড় করলে সমীরণকে বুঝি ঢেকে রাখা যায়। পাহাড় জমে যায় দরখাস্তের।

চেষ্টা ! চেষ্টা কাকে বলে ! হাতে ধরার যোগ্য নয় যে, তার পায়ে ধরেছে। তা ছাড়া কী ! অচেনা, অজানা লোকগুলি এত হৃদয়হীন সমীরণ তা জানত না। শুধু অবহেলা আর অপমান কুড়িয়ে বেড়িয়েছে সবখানে। সমীরণ ভাগ্য ছাড়া দোষ দেবে কার !

অদৃষ্ট বিরূপ। নইলে একা মামাই অনেক কিছু করে দিতে পারতেন। তবু দেননি। ইচ্ছে নেই। চিন্তাও নেই যেন সমীরণের জন্য। পাশ করেই মামাকে জানিয়েছিল চাকরির কথা না। আরো পড়তে চেয়েছিল। কিন্তু মামার চিঠি পেয়ে দমে গিয়েছিল। বড় রাগ হয়েছিল। দুঃখও। মামা নাকি মায়ের আপন ভাই। কিন্তু সেদিন থেকে মামাকে আর ভাল লাগেনি। তারপর চাকরির কথা। মামা সমীরণকে তখনও হতাশ করেছেন। সেদিন থেকে মামাকে চিঠি লেখাই ছেড়ে দিয়েছে।

বাবা বেঁচে নেই। থাকলে কী হত কে জানে।

সমীরণ কিন্তু জানে। এসব দেখে-শুনে খুশিই হতেন রামশংকর। 'উদার হাসি হেসে বলতেন, এই ভালো। আত্মনির্ভরশীল হও। দুনিয়ায় তুমি ছাড়া তোমার ভাগ্যনিয়ন্তা দ্বিতীয় কেউ নেই। পৃথিবীতে বাঁচতে হলে সংগ্রাম করতে হবে। জীবনের লক্ষণই যে তার দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব-হীনতার নামই যে মৃত্যু। মামা-মেসো কেউ কিছু না। তুমিই তোমার। বিনা যুদ্ধে পা রাখার মতও সূচ্যাগ্র মেদিনী তুমি পাবে না। পৃথিবী চিরকাল বীরভোগ্যা, সুতরাং শক্তি সঞ্চয় কর। একটুতেই ভেঙ্গে পড়ো না।'

আদর্শবাদী রামশংকর। সমীরণ তাঁরই ছেলে। তবু বাবার আদর্শ মেনে চলা দুষ্কর। সংগ্রাম করতে গিয়ে সমস্ত শক্তিই যেন ফুরিয়ে যায়। বড় অসহায়, দুর্বল মনে হয় নিজেকে।

বিপদনাশিনীও তাড়া দেন। বলেন, 'কই, কী করছিস তুই। এত লোকের চাকরি হয়, শুধু তোর হয় না কেন? মন বড় অবুঝ একটুও ধৈর্য নেই বিপদনাশিনীর। না বুঝে ছেলেকেই অযথা দোষেন।

সমীরণ তাই থাকতে পারে না। বাইরে যেতে হয়।...

ডানলপের বড় সাহেবকেও ভোলেনি সমীরণ। স্পষ্ট মনে আছে তার কথা। তিনদিন ঘুরেও দেখা পায়নি। তবু আরেকদিন গিয়েছিল তার কোয়ার্টারে। আপিসে ঢোকার হুকুম নেই। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবে গেটপাশ মেলে। সমীরণের কাছে তা হাতে চাঁদ পাবার সামিল। সাধ্য কী ভেতরে ঢোকে। তাই কোয়ার্টারেই যেতে হয়েছিল। বড় সাহেবের স্মরণাপন্ন হতে হয়েছিল। বলা তো যায় না, বেড়ালের ভাগ্যেও শিকে ছেঁড়ে কখনো-কখনো। নিজের পরিচয় ঠিক মত পেশ করতে পারলে হয়তো ভাগ্যের মোড় ফিরে যেতে পারে। ফিরিয়ে দিতে পারেন বড় সাহেব। সুযোগ পেলে বড় সাহেবকে বলবে সে, আপনাকে আমি চিনি। তবে চোখে দেখে বা আলাপ করে নয়। আপনার লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আপনার গল্প আমি পড়েছি। আমিও লিখি যে!

অবশ্য বড় সাহেবের লেখা সমীরণ পড়েনি। তা হোক। তবু বলতে বাধা কী? রবি ঠাকুর যাঁকে খাতির করতেন, চিঠি লিখে তারিফ করতেন লেখার (সাময়িক পত্রে এ-সব চিঠি সমীরণ দেখেছে), তাঁকে দু-একটা মিষ্টি-মধুর বুলি শোনাতে মুখে আটকাবে না সমীরণের। বরং পেট পুরে ভাল-মন্দ খাওয়ার পর সুগন্ধি মিষ্টি পানের মতই লাগবে তা বেশ মুখরোচক। এবং তৃপ্তিদায়ক।

বড়সাহেব খুশি হয়েই বলবেন, ও, আপনিই! তা এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে আসুন।

বড়সাহেবের পিছু-পিছু সাজানো-গোছানো ড্রইংরুমে এসে বসবে সমীরণ। ডুবে যাবে একটা সোফার নরম শরীরে। আকাশ থেকে পাতালে তলিয়ে যাবে। তারপর কথায় কথায় আসল কথা বলে বসবে। তখন আর এড়াবার শক্তি থাকবে না বড়সাহেবের। সে বিশ্বাসে কোন ভুল নেই।

ধারনায় গলদ ছিল কোথাও। চিন্তায় গলতি। যোগ-বিয়োগে ভুল ছিল ভাবনার।

কোয়ার্টারের সামনে সমান করে ছাঁটা সবুজ লন। লন পেরিয়ে গেট। একটা কালো ক্রাইস্‌লার এসে থামল গেটের সামনে। থর-থর করে কেঁপে উঠল গাড়িটা। একটা আর্তনাদ। তারপর স্তব্ধ হয়ে গেল হৃদ্‌স্পন্দন। দরজা খোলা, দরজা বন্ধের শব্দ হল। একটা লোককে দেখা গেল এবার। এগিয়ে আসছে এদিকেই। সাদা সুট, কালো টাই, দামী জুতোয় সাড়া-শব্দ নেই। ডান হাতখানা প্যান্টের পকেটে। বাঁ হাতে তিন আঙুলে চেপে রেখেছেন সিগারেটের টিন আর দেশলাইয়ের বাক্স। সমীরণের মনে হল, ইনিই, ইনিই বড়সাহেব!

ঠিকই চিনেছিল সমীরণ। কিন্তু ধারনায় গলদ ছিল তার। হঠাৎ সুখী এবং সুন্দর লোকটাকে মনে হল অস্বাভাবিক গম্ভীর। মুহূর্তে মুখের রং পালটে গেল। সিগারেটের কৌটা হাত বদল হল। চোখের চাউনিটা তীক্ষ্ণ। দৃষ্টিটা সমীরণকে বিঁধছে। ভয়ংকর দেখাচ্ছে লোকটাকে। বিষণ্ণ-সংকুচিত হয়ে সিঁড়ির পাশে সরে দাঁড়াল।

বড় সাহেব কিন্তু চিনে ফেলেছেন তাকে। এক মুহূর্তে বুঝে ফেলেছেন সব। সমীরণের দাঁড়িয়ে থাকার হেতু আর জানতে বাকি নেই বড় সাহেবের। তাই তার বোকা চোখের দিকে তাকিয়ে হাসিতে ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল বড়সাহেবের। সমীরণ জানে, ওটা হাসি নয়। হয়তো বিদ্রূপ। নয়তো উপেক্ষা। বড় সাহেব বললেন, 'কী? চাকরি?'

দু'পা এগুলো সমীরণ। বিপুল আশা কেঁপে উঠল বুকের ভেতরে। হাতদুটো কপালে ঠেকালে। আজ মনে নেই, হয়তো সেদিন হাতদুটো কেঁপে উঠেছিল।

'প্রথমতঃ চাকরি নেই! দ্বিতীয়তঃ চাকরি বাড়িতে পাওয়া যায় না!' দুটি কথা। মাত্র দুটি কথায় শুরু, দুটি কথাতেই শেষ। আর কিছুই বললেন না বড় সাহেব। আর ফিরে তাকালেন না সমীরণের দিকে। চোখের পলকে অদৃশ্য হলেন বড় সাহেব।

মাত্র দুটি কথার ফুৎকারে মুখের সমস্ত আলো নিবে গেল। ডেলা পাকানো কৃমির মত কণ্ঠ চেপে ধরল দুর্বোধ্য এক কান্না। সমীরণ বোবা

হয়ে গেল মুহূর্তে। নিজের উপরে অপরিসীম ঘৃণায় ভরে উঠল মনটা। দু'দণ্ড আগের আশাটা এখন মাথা খুঁড়ে মরতে লাগল হৃদপিণ্ডের তালে-তালে, সমীরণ ঘুরে দাঁড়াল। পা বাড়াল পথে।

দু'পা এগিয়েছে অমনি পিছু-ডাক। 'শুনুন!'

—আমাকে বলছেন?

—তবে কাকে? সিঁড়ির নিচের ঘরে ভেজানো দরজার ফাঁকে একখানা কৌতুহলিত মুখ। চকচকে টেকো মাথায় নজর পিছলে যায়। মুখখানা অরণ্য। কাঁচা-পাকা মুখ ভর্তি দাঁড়ি-গোঁফের ফাঁকে উঁচিয়ে আছে টিলার মত নাকের ডগাটা। আকাশের মত বিস্তৃত তালু-কপালের নিচেই ভাবদগ্ধ দুটি ক্ষুদ্র জলাশয়। বড় করুণ, বড় করুণা মাখা দুটি চোখ। চাপা ঠোঁটের ফাঁকে চুলের মত স্মিত হাসির রেখাটি বেশ স্পষ্ট!

—কোত্থেকে আসছেন?

—ওপার থেকে।

—আজ নিয়ে কদিন হল আসা?

—চারদিন।

—কে পাঠিয়েছে আপনাকে?

কথাটা বোধগম্য হল না। বুঝতে পারল না। রহস্যের মত ঠেকেছে লোকটাকে। সমীরণ অবাক হয়ে, অপলক চোখে তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে। এবার একটু হাসল। বেশ সহজ ভাবে একটা হালকা হাসির ঢেউ খেলে গেল ঠোঁটে। ঠোঁট থেকে চোখে, চোখ থেকে সারা মুখে জলের মত ছড়িয়ে গেল হাসিটা। লোকটা বলল, 'কথাটা আপনাকে বোঝাতে পারলাম না বুঝি? দেখে মনে হয়, লেখা-পড়া জানা আছে বেশ। অথচ সহজ কথাটার মানে বুঝতে এত দেরি! আশ্চর্য!' একটুকাল থামল। আবার বলতে শুরু করে, 'এ সব জায়গায় থ্রু প্রপার চ্যানেলে আসতে হয়, তা-ও জানেন না? হয় মামা, নয় তো ম্যাও! এ-দুয়ের একটিও যার নেই চাকরির স্বর্গদ্বার তার কাছে চির-দিনের মতই বন্ধ!'

আবার হাসল লোকটা। অত্যন্ত নিরাশ ভঙ্গিতে মাথাটা কাত হয়ে গেল ঘাড়ের উপর। বুঝছি, কথাটা এখনো আমি আপনার মাথায় ঢোকাতে পারিনি। আচ্ছা, ওপারে থাকেন বললেন তো?

সমীরণ বললে, 'হ্যাঁ।'

—নিকুঞ্জ ঘোষকে চেনেন? নাকি চেনেন না?

—চিনি। অত্যন্ত মৃদু গলায় উত্তর দিল সমীরণ।

—তবে? তবে আপনার চিন্তা কিসের শুনি? চাকরি তো আপনার হয়ে আছে! ইফ্‌ দেয়ার ইজ্‌ নো ভ্যাকন্সি, ইট্‌ উইল বি ডিউলি ক্রিয়েটড্‌ ফর ইউ, বাই নিকুঞ্জ ঘোষ। হি ইজ্‌ দি রাইট্‌ হ্যাণ্ড অব্‌ আওয়ার বড় সাহেব। গো, গো, ডোণ্ট্‌ ডিলে! অয়েল হিম্‌ এ্যাট্‌ওয়ান্স্‌! এবার সশব্দে হেসে উঠল লোকটা। শব্দ করে বন্ধ হল দরজাটা। মুখটা লুকিয়ে নিলেন ভেতরে।

লোকটাকে পাগল মনে হল সমীরণের। কেমন ক্ষ্যাপা, একরোখা মানুষ। বড্ড কাটা-কাটা কথা। কথা নয়, নিমের মধু।

কিন্তু পথ চলতে-চলতে টের পেয়েছিল সমীরণ, মেঘের মত মনের স্তরে স্তরে যে-ব্যথা জমে উঠেছিল, বড় সাহেবের অবজ্ঞায় যে কান্না তার কণ্ঠ চেপেছিল, লোকটা মন্ত্র বলে তাকেই উড়িয়ে দিয়েছে কোথায়! মনটা এখন হালকা। মাথাটা এখন সোজা। অপমানের জ্বালায় নুয়ে-পড়া ভাবটা আর তেমন করে আচ্ছন্ন করতে পারছে না তাকে। এবং পথে নেমেই তা বুঝতে পারে সমীরণ।

তবু-ও নিকুঞ্জ ঘোষের কাছে সমীরণ যায়নি। যাবে না কোন দিন। বাবার বন্ধু জেনেও না। শাস্ত্রমতে নিকুঞ্জ ঘোষ পশ্বাচারী তান্ত্রিক। কারণ এবং শক্তি, দু'য়ের-ই সমান উপাসক। উপাসনার উপাচার জোগাতে না পারলে বর দেন না কাউকে। সমীরণ অপারগ। সমীরণ তাই নিকুঞ্জ ঘোষের কাছে যাবে না কোন দিন।···

সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছিল নাটা দত্তকে। কথা শুনে হাসি পেয়েছিল

সমীরণের। চটকলের হাজিরা বাবু। বেঁটে-খাটো গোল আলুর মত চেহারা। মুখখানা মাখা সন্দেশের ডেলা। দেখতে ছোট আর কোলা ব্যাঙের মত শরীরটার সঙ্গে নাটা ফলের ছোট্ট গোলাকার বীচিটির হয়তো সাদৃশ্য নেই কোন। তবু আসল নাম হারিয়ে লোকটা নাটা দত্ত নামেই পরিচিত। কে দিয়েছিল, আর কবে থেকে প্রচারিত হয়েছিল নামটা তা কেউ জানে না। কিন্তু এ নামেই সবাই ডাকে। এবং সে ডাকেই সাড়া দেন নাটা দত্ত। এখন আর রাগেন না। জ্বলে ওঠেন না দপ করে।

সমীরণের কথা শুনে পাইলটের মত ফিতেয় বাঁধা চশমাটাকে কপালে তুলে দেন নাটা দত্ত। চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমে কুঁচকে যায়। ভুরু-চোয়ালের মাংসের খাঁজে দৃষ্টি ডুবে যায়। চাউনিটা বুঝতে পারে না সমীরণ। শুধু কানের দুপাশে কয়েকটা রেখা দেখা যায় স্পষ্ট। বোয়াল মাছের মত বিঘত খানেক বেড়ে যায় হা-টা। মুখ-গহ্বরের সবটুকুই দেখতে পায় সমীরণ। আল-জিবটাও নজর এড়ায় না তার। আনন্দের আতিশয্যে এমনি করেই হাসেন হাজিরা বাবু। নাটা দত্ত বলেন, ইয়ং ম্যান, চটকলে চাকরি খুঁজতে এসেছো? শেম্ শেম্। ইট ইজ ডিসক্রেডিট ফর ইউ! তার থেকে কালচার করো! বুঝেছ, কালচার করো! আমি তো আমার ছেলেদের বলি, বসে না থেকে মনের কালটি-ভেশান্ বাড়াও। আজ না-হোক, ভবিষ্যতে কাজ দেবে। আর এই চাকরি-বাকরি কিছু না। বুঝেছো? স্রেফ দিনগত পাপক্ষয়। নইলে আমি ছিলাম স্কুলের সেরা ছাত্র। ইংরেজীতে আশি নম্বর রেখেছিলাম একবার। হেডমাষ্টার মশাই বলতেন, 'বাবা নাটু, তোমার ওপরেই স্কুলের সুনাম-দুর্নাম নির্ভর করছে। মান রেখো বাবা।' মান রাখবো কী? আমাদের ইংরেজীর মাষ্টার ছিল ভারী ত্যাঁদর। যে সব কোশ্চান আমাকে দাগিয়ে দিল পড়তে, তা পড়ে আমি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ফেল করলাম, তা আবার ঐ তোমার ইংরেজীতেই। আমার ফাদার ছিলেন এক রোখা মানুষ। আর আমাকে পড়ালেন না। বললেন,

'আমাদের বংশে তুই-ই প্রথম ফেল করলি। আর না'। ঢের শেখা হয়েছে। এবার চাকরি কর।' যেই কথা সেই কাজ। বুঝলে কিনা, বাবা আমাকে চটকলে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর বিয়ে। শেষে যা হয়। গুষ্টির পিণ্ডির জোগাড়েই সারা জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল আমার। তবুও বুঝলে কিনা, আমরা যা শিখেছি, তাই ভাঙ্গিয়ে আজও খাচ্ছি। তোমাদের আমলে পুঁজি বলতে কানাকড়িও নেই। স্রেফ ফাঁকি। ফাঁকি দিয়ে পাশ করে এখনকার ছেলেরা। দেখছি তো আমাদের নতুন হেড ক্লার্কের অবস্থা। এক লাইন ইংরেজী লিখতে পাঁচ কলমের দফা রফা। জুতের কলম না হলে লিখতে পারেন না আমাদের বড় বাবু। এই তো অবস্থা। কিন্তু বলুক দেখি কেউ? আজ পর্যন্ত নাটা দত্তর গ্রামাটিক্যাল মিস্‌টেক্‌ ধরতে পেরেছে কেউ? হুঁ, হুঁ, বাবা এ বড় শক্তঘানি। এখানে ফাঁকির কারবার নেই মোটে। তুমি কিন্তু ভুল বুঝো না ইয়ং ম্যান। রাগ করো না আমার কথায়। তুমি তো জুয়েল। তাই বলছি, এই বাজে কাজের চিন্তা ছেড়ে কালচারে মন দাও। মনের কালটিভেশান বাড়াও।

উশ্‌খুশ্‌ করছিল সমীরণ। বেজায় হাসি পাচ্ছিল তার। বললে, আজ্ঞে ঠিক কথাই বলেছেন আপনি। যা শিখেছি, তাতে করে ব্যক্তিগত-ভাবে আমার নিজেরই লজ্জার সীমা নেই। তবু আপনার কাছে এসেছি অন্য আশায়। আপনি বললে, আমার একটা হিল্লে হয়ে যায়।

—হবে না কেন? বলি কেন হবে না? নাটা দত্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। আমি কি আজকের মানুষ? এই কলের জন্ম দেখেছি আমি।

—আজ্ঞে সেই জন্যেই তো আপনার কাছে আসা।

—ঠিক হ্যায়, ইয়ং ম্যান ডোণ্ট থিংক্‌। আমি তোমার জন্য একটা সুটেব্‌ল পোস্টের খোঁজ করছি। খবর দিলেই কিন্তু আসা চাই। তখন আমাকে বেকুব বানালে চলবে না।

সমীরণ বলল, 'আপনাকে খবর পাঠাতে হবে না। আমিই এসে না-হয় খোঁজ নেব মাঝে-মাঝে।'

—নো, ডোণ্ট কাম টু মাই শেলটার এগেন। লোকে সন্দেহ করবে তাতে। বলবে, নাটা দত্ত ঘুস খায়।

বাইরে এসে হাসি আর পেটে চেপে রাখতে পারেনি সমীরণ। আপন মনে হো-হো করে হেসে উঠেছিল সে।

নাটা দত্তর কথা ভাবলে এখনো হাসি পায়। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে নাটা দত্তকে।......

ভোলেনি। সমীরণ এদের কাউকে ভুলবে না। অপরিসীম ব্যথার মত, দূরারোগ্য ক্ষতের মত সমস্ত অপমান, সমস্ত উপেক্ষা এক তীব্রতম জ্বালা হয়ে বেঁচে থাকবে চিরদিন।......

তারপর এই!

ধরতে গেলে একটা চাকরিই। তিরিশ টাকা মাস মাইনের গোটা একটা চাকরিই জুটে গেল সমীরণের। এবং সমীরণই পেয়ে গেল কাজটা। নেহাৎ বরাত। নইলে অন্য কেউ পেতো কাজটা। ওৎ পেতে ছিল কিনা তাই বা বিচিত্র কি!

বিপদনাশিনী বলেন, 'বুঝলি খোকা, একেই বলে অদেষ্ট। ফুল না ফুটলে যেমন বিয়ে হয় না, এ-ও তেমনি। সময় না হলে চাকরি জোটে না কারো।'

সমীরণ ভাবে, নিছক সত্য না হোক, ষোল আনাই মিথ্যে নয় কথাটা। কারণ নিজের জানা প্রায় সকলগুলি দেবতাকেই অন্তত একবার মানত করেছেন বিপদনাশিনী। ছেলে চাকরি পেলে এদের যে কেউ একটা ষোড়শোপচার পূজো পাবেই। তবুও সেদিকে খেয়াল ছিল না দেবতাদের। সমীরণের একটা হিল্লে হয়নি।

এবার হুঁশ হয়েছে। দেবতা চোখ তুলে তাকিয়েছেন। তাই টুইসানিটা জুটে গেল সমীরণের। ধরতে গেলে একটা চাকরিই। তিরিশ দিনের যাতায়াত। ছুটি নেই। রোববারেও যেতে হয়। সমীরণ আপত্তি করে না। রোজ যায়।

তারপর একদিন দুদিন করে তিনটি মাস উধাও হল কেমন করে।

এখন আর ভাল লাগে না এখানে। একটা চাকরি খুঁজছে সমীরণ। পেলেই ছেড়ে দেবে ট্যুইশানিটা। ভাল লাগে না। শুধু ইলা ছাড়া তিন মাসে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছে সমীরণ। কিন্তু আলাপ হয়নি কারো সঙ্গে। তাই বার বার বড় খাপছাড়া অস্বস্তিকর মনে হয়েছে এই পরিবেশটা। কেমন অচেনা।

তিন দিন। তিনটি দিন-ই বড় বিচিত্র।

প্রথম দিন কথা বলেছেন কণিকা সেন। মাইনের টাকাটা হাতে দিতে দিতে বলেছেন, 'ইলা পড়ে তো ?'

সমীরণ বুঝতে পারেনি। অবাক চোখে বোকার মত কণিকার দিকে তাকিয়ে থেকেছে কেবল। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে যেন বলেছে, 'পড়ে বৈ কি।' তারপর লজ্জা পেয়েছে সমীরণ। নিজের উত্তর শুনে নিজের কাছেই খারাপ লাগছে। ইলা কি ছোট্ট একটা মেয়ে। তাকে পড়িয়ে দিতে হবে। মনে মনে কথাটা আলোচনা করে সমীরণ হেসেছে শুধু।

কণিকা সেন যেন অনুনয় করেন, 'দয়া করে একটু লক্ষ্য রাখবেন ওর দিকে। আমি তো দেখতে পারিনে সব সময়। আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। বাড়িতে লোকজনের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। তার উপরে রোজই পার্টি লেগে আছে বাইরে। সব আমাকে সামলাতে হয়। ইলার জন্য আপনি আছেন। ওকে দেখবেন।'

এবারের হাসি পেয়েছে সমীরণের। কণিকা সেনকে মনে হয়েছে একটা ভঙ্গি। মেয়ের জন্য মায়া না। নিজের মর্যাদার কথা শুনিয়ে সমীরণকে বোবা বানাবার চেষ্টা।

আরেক দিন এসেছিলেন সেন সাহেব স্বয়ং।

রেডিওতে গান হচ্ছিল। সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত। যেন কুইনিন খাওয়া একরাশ বিস্বাদ-বিরক্তি মুখে মেখে এ ঘরে এলেন সেন সাহেব। রেডিওটা বন্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে। বুঝি রাগ হল ইলার। একবার মুখ তুলে দেখল সেন সাহবকে। আবার চোখ

নামিয়ে নিল নীরবে। ঘৃণায় ঠোঁটটা বেঁকেই রইল যেন। সমীরণের মনে হল তাই। ইলাকে দেখে অবাক হল সমীরণ।

ঠিক তখন। পাশের ঘরের রেডিওতে প্রচার হচ্ছে কি একটা তেলের বিজ্ঞাপন। এবাড়িতে ঘরে ঘরে রেডিও।

বেরিয়ে যাচ্ছিলেন সেন সাহেব। যেতে যেতে থেমে যান হঠাৎ। দু'পা এগিয়ে আসেন কাছে। বলেন, 'একটু কড়া নজর রাখবেন ওর ওপর। কোথাও যেতে দেবেন না যেন।' তারপর খানিক থেমে ফের বলেন, 'আর এসব বাজে গান-টান শোনা বেশি ভাল না। মাথা বিগড়ে যায় এতেই। কী বলেন?'

চুপ করে থেকেছে সমীরণ। উত্তর দিতে পারেনি। সাহস হয়নি। ইচ্ছেও না।

অন্যদিন বিজয়ের সঙ্গে। বিজয় সেন সাহেবেরই ছেলে। কিন্তু কণিকার না। বিজয় হয়তো বয়সে বড়ই হবে কণিকার। কিম্বা সমবয়সী ওরা। বিজয় তাই মা ডাকে না কণিকাকে। কিছুই ডাকে না। সমীরণ লক্ষ্য করে দেখেছে ওদের দুজনের মেলা-মেশা এবং কথাবার্তার ধরণটুকুও কেমন খাপছাড়া। আলগা-আলগা। দেখে-শুনে প্রথম প্রথম আশ্চর্য হয়েছে সমীরণ। এখন কিন্তু হয় না আর। বরং মা-ছেলের সম্পর্ক এড়িয়ে ওদের এভাবে বন্ধুভাবে থাকাটাই কেমন সহজ, স্বাভাবিক মনে হয় সমীরণের।

বিজয়ের মা এখানে থাকেন না। আসেন না আর। কলকাতায় বাপমায়ের কাছেই থাকেন। বিজয় এখানেই। অন্য কোথাও সে যায় না আর। যাবে না। হয়তো মায়ের কাছেও না।

বিজয়ের চোখ দুটোই খারাপ। মোটা লেন্সের চশমা ছাড়া কিছুই দেখে না ও। শরীরটাও ভীষণ দুর্বল। হয়তো লেখাপড়াও বেশি দূর হয়নি সেজন্যে। চাকরিও না। নইলে সেন সাহেবের কলমের একটি খোঁচায় এতদিনে ও অনেক কিছুই হতে পারতো। কিন্তু তা

হয়নি। বিজয় এখন বেকার। তাই বলে সমীরণের মত মনে ওর দুঃখ নেই। যন্ত্রণা নেই কিছু। দায়-দায়িত্ব নেই কারুর। বিজয় তাই সুখী। নইলে পোষা কুকুরের মত অষ্টপ্রহর কণিকা সেনের পিছু-পিছু ঘুরে বেড়াতে পারে কেউ!

বিজয় বলে, 'আপনাকে ডাকছে।'

একটা অঙ্ক বুঝিয়ে দিচ্ছিল ইলাকে। খাতার উপরেই পেন্সিলটা চালাতে-চালাতে ঘাড় ফিরিয়ে সমীরণ জিগ্‌গেস করে, 'কে?'

'ভেতরে।' আর একমুহূর্ত দাঁড়ায় না। পলকে অদৃশ্য হয়ে যায় বিজয়।

চিন্তিত মুখে ইলার দিকে তাকায় সমীরণ। ইলা হাসে। বলে, 'যান। চলুন না হয় আমার সঙ্গে।'

শোবার ঘরে কি করছিলেন কণিকা সেন। বাইরে পায়ের শব্দ শুনে বেরিয়ে এলেন তাড়াতাড়ি। পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দরজা আগলে দাঁড়ালেন যেন। একটুখানি ইতস্তত ভাব। বুঝি ভয়। কণিকা সেনের বুকটা দ্রুত ওঠানামা করছে মনে হল। বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে দেখল সমীরণ। দেখে অবাক হল।

ভুরু কুঁচকে গেল ইলার। যেন মাকে অসহ্য লাগছে ওর। ঘৃণা হচ্ছে। মনে হল দাঁতে দাঁত ঘসছে ইলা। মায়ের সঙ্গে যেন মিল নেই মেয়ের। মনেমনে রেশারেশি লেগেই আছে সর্বক্ষণ। দেখে-দেখে সমীরণের তাই মনে হয় আজকাল। পারতপক্ষে মায়ের সঙ্গে যেন কথা না বলতে হলেই বেঁচে যায় ইলা। ওদের দুজনের আলাপ কখনো শোনেনি সমীরণ। ইলা যেন ফিরে যেতে চায়।

নিজেকে সামলে নিতে সময় লাগে না বেশী। কণিকা সেন বলেন, 'আপনাদের বাড়ি এখান থেকে কতদূর মাস্টার মশাই?'

অবাক হয়ে মায়ের মুখ দেখে ইলা। সমীরণ বলে, 'মাইল দুয়েক হবে।'

'—ইলা কাল আপনার ওখানে যাবে। ওর ভারী ইচ্ছে। মুখ ফুটে হয়তো বলতে পারছে না আপনাকে। কোথাও তো বেড়াতে যায় না। আপনি তা হলে কষ্ট করে আর আসবেন না কাল। গাড়ি করে

আমিই পাঠিয়ে দেবো ইলাকে। মধু চেনে তো আপনার বাড়ি ?'

—'হ্যাঁ।' জবাব দেয় সমীরণ। কিন্তু মানে বোঝে না কণিকা সেনের কথার। ইলাকেও এত লজ্জাবতী মনে হয়নি তো কখনো। সবটাই কেমন হেঁয়ালি। ধাঁধাঁ মনে হয় সমীরণের।

বুক থেকে এক ঝলক রক্ত বুঝি উঠে এসেছে ইলার মুখে। ভয়ানক লাজুক মনে হচ্ছে ওকে। ও বুঝি কেঁদে ফেলবে এখুনি। দু'চোখ ওর কান্না আর ধিক্কার মিশে রয়েছে একসঙ্গে। ইলা পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নড়তে পারে না এক পা। আর বুঝি দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। যেন ভয় পেয়ে ভেতরে যান কণিকা সেন। দরজায় খিল তুলে দিয়ে বাঁচেন।

ইলার বুঝি এতক্ষণে পা কাঁপে। মুখ তুলে দেখতে পারে না সমীরণকে। লজ্জায়ঘৃণায় মাটিতে মিশে যেতে চায় ও। ইলা পালায়। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। ও এবার কাঁদবে।

এই প্রহসনে নিজের ভূমিকা সমীরণ জানে না। বোকার মত অনেকক্ষণ একলা দাঁড়িয়ে অনেক কথা ভাবে। কিন্তু কুল-কিনারা পায় না কিছুই। তারপর সেদিনের মত সমীরণ বেরিয়ে যায়।

মনেমনে অশেষ সন্দেহ ছিল সমীরণের। ইলা হয়তো আসবে না। বিশ্বাস করা যায় না কণিকা সেনকে। কিন্তু সত্যি-সত্যি পরদিন আসে ইলা। এবং মধুর সঙ্গেই। গাড়ি নিয়ে মধু আবার ফিরে যায় তাড়াতাড়ি। বিপদনাশিনী ইলার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যান।

সমীরণ বলে, 'অসময়ে এলে যে ? বিকেলে আসার কথা ছিল না ?'

মুখ ভার করে না ইলা। অভিমানে অন্যদিনের মত করুণ হয়ে ওঠে না। কিন্তু অন্যদিকে তাকিয়ে প্রায় অন্যমনস্কের মতই উত্তর করে ইলা। 'আসতে যখন হবেই তখন সকাল বেলা চলে আসাই ঠিক করলাম। ওখানে থাকতে যেন আর চাইছিল না মন।'

কথা শুনে অবাক হয় সমীরণ। ইলাকে কেমন করুণ মনে হয়।

বড় মায়া হয় মেয়েটার জন্য। ইলার জন্য এই অকারণ সহানুভূতির কোন মূল খুঁজে না পেয়ে সমীরণ যেন আরো আশ্চর্য হয়। সুযোগ পেয়ে বুঝি এই প্রথম ইলাকে খুঁটিয়েখুঁটিয়ে দেখে সমীরণ। শুধু দেহ না। কথায়কথায় আজ ওর মনের ভেতরেও কত কিছু আবিষ্কারের আশায় সমীরণ ব্যস্ত হয়ে ওঠে। মনে হয়, ব ঃখ এই মেয়েটার। সমীরণের বোধের অগম্য কী এক গভীর অসুখে অহরহ ভুগছে মেয়েটা। ইলাকে ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছিল সেই মুহূর্তে। আর সেইদিনই প্রথম মনে হয়েছিল সমীরণের, ইলা এখন বড় হয়েছে। সংসারের যাবতীয় ভালমন্দের মানে বোঝার মত বয়স হয়েছে ওর।

সারাদিন এখানেই থাকে ইলা। যত্নের আতিশয্য নেই। কিন্তু ত্রুটি সেই বিপদনাশিনীর দিক থেকে।

অনেক রাত্রে মধু-ই আসে আবার। ইলা বিপদনাশিনীর পাশে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বড় সংকুচিত হয়ে পড়েছিল সমীরণ। লজ্জা পাচ্ছিলেন বিপদনাশিনী। অতি সহজ আর আপন করে ভাবতে গিয়ে নিজের মনের কাছেই বাধা পাচ্ছিলেন। আজ যেন তাদের মা এবং ছেলেকে সমান ভাবেই পীড়িত মনে হচ্ছিল। সাংসারিক দারিদ্র্য বোধটুকু নতুন করে উদয় হচ্ছিল মনের মধ্যে। ইলাকে মনে হচ্ছিল আস্তাকুঁড়ে গোলাপ ফুলের মত। বড্ড বেমানান লাগছিল। নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত অশোভন লাগছিল ওকে। কিন্তু ইলা যেন জল। যে পাত্রে থাকে তারই আকার নেয়। মাত্র একটি দিনের কয়েক ঘণ্টার আলাপে কেমন করেই না বিপদনাশিনীর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। দেখে খুশি হয় সমীরণ। অবাক হয় আরো।

বড় দুর্বোধ্য লাগে কণিকা সেনকে। হঠাৎ ইলাকে এখানে পাঠানোর খেয়ালের যেন মানে নেই। অন্তত সমীরণ কিছু বোঝে না। ব্যাপার রহস্যময়। বড়লোকের খেয়াল হয়তো এমনি। যার কোন মানে নেই। সমস্ত ব্যাপারটার গুরুত্ব ভুলে আবার এমনি একটা সহজ মানে করার চেষ্টায় সমীরণ খুশি হতে চায়।

কাঁচা ঘুম ভেঙে যায়। ইলা বুঝি বিরক্ত হয় মধুর ওপর। বিপদ-নাশিনীর দিকে চেয়ে বলে, 'আমি যদি না যাই।'

বিপদনাশিনী হাসেন! বলেন, 'পাগল।'

ইলা যেন কাউকে গ্রাহ্য না করেই মধুকে বলে, 'তুই যা, আমি গেলাম না বলগে।'

মধু যায় না দাঁড়িয়েই থাকে। শেষে আমতা-আমতা করে বলে, 'তোমাকে যেতে হবে দিদিমনি। মেম সায়েবের শরীর খারাপ।'

—'আমি গেলেই সেরে যাবে?' ইলা যেন বিরক্ত হয়। বলে, 'হঠাৎ কী হল আবার?'

—'আমি আসার সময় বমি করতে দেখে এসেছি।'

ইলা যেন ঘৃণায় বিকৃত করে মুখটা। এই মুহূর্তে মেয়েটাকে ভারি জেদি মনে হয় বুঝি বিপদনাশিনীর। বলেন, 'সে কি, মায়ের অসুখ জেনেও যাবে না!'

—'আমি গেলেই কি রোগ সেরে যাবে? এ রোগ যে প্রতিদিনের।' গলাটা ধরা-ধরা লাগে ইলার।

তবুও সারাদিনের ভাল লাগা মেয়েটাকে হয়তো এই মুহূর্তে ভারি পাকা মনে হয় বিপদনাশিনীর।

মধুর সঙ্গে গাড়িতে উঠতে উঠতে ভেজা গলায় ফের সমীরণকে বলে ইলা, 'আমার এখনো যেতে ইচ্ছে করছে না মাষ্টার মশাই। অনেক দিন এমন করে খুশি হতে পাইনি।' আবছা আলোতে চোখ দুটো চক-চক করে ইলার। গাড়িটা ছেড়ে দেয়।

বড্ড ছেলেমানুষ ইলা। একটু বেশী মাত্রায় আবেগ প্রবণ। বড় লোকের আদুরে মেয়েরা সচরাচর যা হয় আর কি। বাইরে থেকে ঘরে যেতেযেতে সেদিন ইলার সম্পর্কে আর কিছুই ভাবতে পারেনি সমীরণ।

এরপরে কিন্তু ইলা নিজেই এসেছে অনেকবার। কারো আদেশ কিম্বা আমন্ত্রণের অপেক্ষা না করেই। কখন যেন আস্তে আস্তে মনটা দুর্বল হয়ে পড়েছে বিপদনাশিনার। ভাল-মন্দে মেশা ইলাকে ভাল

লাগতে শুরু করেছে। এখন একদিন মেয়েটা না এলে বুঝি কেমন করে মনটা। মুখ দেখে বিপদনাশিনীর মনের এই অবস্থাটা বোঝা যায়। বুঝতে পারে সমীরণ।

বেশ মনে আছে কথাটা। একদিন ইলা বেরিয়ে গেলেই যেন আপন মনে কথাটা বলছিলেন বিপদনাশিনী, 'ভিন্ন জাত না হলে মেয়েটাকে পর হয়ে থাকতে দিতাম না।'

মনে মনে উৎফুল্ল হয়েছিল সমীরণ। ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'কী করতে তবে ?'

—'সে যখন হবার নয়, তোকে বলে কী হবে।' জবাব দিয়েছিলেন বিপদনাশিনী। মায়ের গলায় যেন এক গভীর বিষণ্ণতা জড়ানো ছিল। আপশোষের মতই শুনিয়েছিল কথাটা।

সমীরণ তবু শুনতে চেয়েছিল কথাটা। সব বুঝেও না বোঝবার ভান করেছিল। বলেছিল, 'তবু শুনি, কী করতে ?'

—'ছেলের বৌ করে ঘরে রাখতাম।' বলেই হেসে ফেলেছিলেন বিপদনাশিনী। সমীরণের কানে মায়ের কথাটা কেমন করুণ শুনিয়েছিল।

টং-টং করে দেয়াল-ঘড়িতে দশটা বাজে। চমকে ওঠে সমীরণ। তন্দ্রাতুর চোখ মেলে বাইরে তাকায়। এখনো বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। অনেকদূরে রাস্তার বাতিগুলি অতন্দ্রচোখে তাকিয়ে। আলোগুলি কেমন আবছা। আলোর বৃত্ত ঘিরে বৃষ্টির ঝালর ঝুলছে। ওপাশের গাছ-গাছালি স্তূপীকৃত অন্ধকার হয়ে মাতামাতি শুরু করেছে। হাওয়া বইছে সাঁই-সাঁই। এইবার ঝড় শুরু হল বুঝি। আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে মনটা। অস্বস্তি বোধ করে সমীরণ। বাড়ির কথা মনে পড়ে। মায়ের জন্য দুশ্চিন্তা। বিপদনাশিনীর শরীর ভাল না। অসুখ। আজ কদিন থেকেই শয্যাশায়ী। দু'দিন কোন চেতনা ছিল না। আজ সকাল থেকেই জ্বরটা নেই। কথাও বলছেন। সমীরণ অনেকক্ষণ মায়ের পাশে বসে গল্প করছে আজ। বিপদনাশিনী বলছিলেন, 'কিছুই তো হলি না রে!'

সমীরণ কোন জবাব দিতে পারেনি। মায়ের মুখের দিকে অবোধ চোখে তাকিয়ে থেকেছে কেবল। ছেলেকে অমন করে চুপ করে থাকতে দেখে চোখ বুজে গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আবার বলছেন বিপদনাশিনী, 'লেখা না থাকলে দেখা হয় না। আমার কপালেও লেখা নেই তোর ভাল দেখা।'

একবারে কথা বলতে বুঝি কষ্ট হয় বিপদনাশিনীর। তাই থেমে থেমে বার বার বলেছেন। সমীরণ শুনে গেছে। 'উনি বলতেন, তুই নাকি খুব বড় হবি। কিন্তু কই, কী হলি তুই বল তো?'

সমীরণ এবারও উত্তর দিতে পারেনি। মায়ের চোখে চোখ রেখে মিটিমিটি হেসেছে শুধু। এ কথার যেন হাসি ছাড়া উত্তর নেই। অন্তত সমীরণের জানা নেই।

—'তোর মামাকে চিঠি দিয়েছিস?'

—'না।' এবার কথা বলেছিল সমীরণ। সংক্ষেপে কঠোর জবাব দিয়েছিল।

বিপদনাশিনী খানিক তাকিয়ে হেসে বলেছিলেন, 'মানুষের উপর রাগ করে কি হবে বলতো? তোর কপাল যাবে কোথায়? ওঁরা আত্মীয় তাই রাগটা তোর যায় না। কিন্তু যারা সরাসরি অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে, কই তাদের তো কিছু করতে পারিসনে। তুই বোকা। অভিমান তোর বেশী। ওঁর স্বভাবটাও ছিল এমনি জেদি। সেই রক্ত যাবে কোথায়!' আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন বিপদনাশিনী।

—'মামাকে চিঠি লেখ। আমার ভারী দেখতে ইচ্ছে করে। তোর কাছে পর হতে পারেন। কিন্তু আমার যে ভাই।' বিপদনাশিনী মুখ ফিরিয়ে চোখের জল মুছেছিলেন।

সমীরণ এখনো মামাকে চিঠি লেখেনি। কালকেই লিখতে হবে। মনে মনে কথাটা যেন কয়েকবার উচ্চারণ করে সমীরণ।

মা বলেছিলেন, 'আজ বার বার ওঁকে মনে পড়ছে। শেষ রাত্রে

স্বপ্নে দেখেছি। শেষ রাতের স্বপ্ন নাকি মিথ্যে হয় না। খোকা, আমি হয়তো আর বাঁচবো না।'

টিক-টিক-টিক। দেয়ালে আলোর কাছে একটা টিক টিকি শব্দ করে। একটা পোকাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে যায় সরীসৃপটা। বুকটা কেঁপে ওঠে সমীরণের। টিকটিকির কথা নাকি সত্যি হয়। মানুষের ভাবনাচিন্তা কথাবার্তার পিঠে এমনি করে শব্দ করে ওরা। আর সেই কথা, সেই চিন্তাও সত্যি হয় তেমনি। খনার জিব খেয়ে এমনি দৈবজ্ঞ হয়ে উঠেছে ওরা। একথা সমীরণ বিশ্বাস করে না। কিন্তু এই মুহূর্তে মনটা ভীষণ দুর্বল হয়ে যায়। বাড়িতে মা একা। পাশের ঘরের শোভনা হয়তো মায়ের কাছে এত রাত অবধি বসে নেই আর। এখন ঘুমিয়েছে শোভনা। শুধু একলা বিছানায় ছটফট করছে মা। সমীরণ তবু যেতে পারছে না! বাইরে মুষলধারা বৃষ্টি-ঝড় শুরু হয়েছে এইবার।

ভেতর থেকে কেউ আর আসছে না। হয়তো জেগে নেই কেউ। সবাই ঘুমিয়েছে। চারিদিকে ঝড়, বৃষ্টি আর অন্ধকারের মাতামাতির মধ্যে বড় শান্ত, বড় নিঝুম আর ভয়াবহ মনে হচ্ছে সেন সাহেবের বাংলোটা। কবরখানার মতই বড় শান্ত নির্জন আর ঠাণ্ডা। এখানে মানুষ নেই। মানুষের কথাও নেই তাই। বড় একলা লাগে। ভয় ভয় করে কেমন। সমীরণ উঠতে পারছে না। যেতে পারছে না কোথাও। বাইরে ঝড় বৃষ্টি।

টিকটিকিটা সরে যায় না। যায় না কোথাও। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে সামনের পোকাটাকে। কারের পুঁতির মত কালো কালো চোখ দুটোতে শিকারীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। পোকাটা নড়ছে। বুঝি ভীষণ খুশি হয়েছে। উত্তেজনায় মেতে উঠেছে সরীসৃপটা। ঐটুকু একটা প্রাণীকে এই মুহূর্তেই ভয়ংকর হিংস্র মনে হচ্ছে। অস্বস্তি লাগছে সমীরণের। সমীরণ চোখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকায়। সেন সাহেবের ফোটোর দিকে। সেন সাহেবকেও হিংস্র মনে হয়। সেন সাহেবের

পোশাকও শিকারীর। হাতে বন্দুক। পায়ের কাছে আহত হরিণ একটা। হরিণটা কি মরে গেছে! হয়তো না। কিন্তু ভয়ংকর হিংস্র আর অহংকারী দেখাচ্ছে সেন সাহেবকে। সমীরণ তাকাতে পারছে না।

মধুই বলেছিল আজ, 'সাহেব আপনাকে বসতে বলে গেছেন।'

—'সাহেব? আমাকে? কেন?' সমীরণ ভেবে পায়নি হঠাৎ তাকে কি দরকার সাহেবের! বসে-বসে আকাশ-পাতাল ভেবেছে খালি। তারপর সাহেব ফিরে এসেছেন এক সময়। সমীরণ টের পেয়েছে। কিন্তু এ ঘরে এখনও এলেন না। হয়তো সেন সাহেব এখন ঘুমোচ্ছেন। এই বাড়িতে সবাই ঘুমোচ্ছে এখন। শুধু সমীরণ ছাড়া। হয়তো সকাল হওয়া পর্যন্ত এইখানে একলা জেগে থাকবে সে, বাইরে যা বৃষ্টি!

সেদিনও হঠাৎ এই ঘরে ঢুকেছিলেন সেন সাহেব। কোনদিকে না তাকিয়েই জিগ্‌গেস করেছিলেন, 'মাস্টার নাকি পদ্য লেখ? ভীষণ এক ঠাট্টার মত শুনিয়েছিল প্রশ্নটা। যেন রসিকতা করছেন সমীরণের সঙ্গে।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারেনি সমীরণ। দুই চোখে কেমন এক জড়তা নিয়ে তাকিয়ে দেখতে চেয়েছিল সেন সাহেবের প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে মাখা মুখটা। কিন্তু তাকিয়ে থাকতে পারেনি বেশীক্ষণ। লজ্জায় মুখটা নামিয়ে নিয়েছিল সমীরণ।

—'তাহলে কথাটা সত্যি?' আবার জিজ্ঞাসা। যেন এক মস্ত অপরাধ ধরা পড়ে গেছে। সেন সাহেবের ভাবখানা তেমনি। যেমন গম্ভীর তেমনি উচ্ছ্বসিত সেন সাহেব।

সমীরণ আমতা-আমতা করে বলে, 'না, তেমন কিছু লিখিনে। মাঝে-মাঝে দু-একটা কবিতা। কিন্তু কে বললে আপনাকে?'

—'কে আর বলবে। ইলাই তো তোমার ওখানে যায় আজকাল। ও-ই হয়তো গল্প করেছে ওর মাকে। ইলা তো তোমার ব্যাখ্যায় পঞ্চ-মুখ।' সেন সাহেব এবার হাসেন। চার দেয়ালে ঘা খাওয়া হাসিটাকে

গর্জনের মত শোনায়। সমীরণ বুঝি কেঁপে ওঠে। অকারণ ভয়ে শিউরে ওঠে।

ইলার দিকে চোখ ফেরাতেই চমকে উঠেছিল সমীরণ। খাতার উপর লিখতে লিখতে কলমটা থেমে গেছে ইলার। ইলা যেন পাথর হয়ে গেছে। নিশ্চল, নিস্পন্দ মনে হচ্ছে ওকে। ফর্সা মুখটা মনে হচ্ছে রক্ত শূন্য। শাদা কাগজের মতই ফ্যাকাশে। আধখানা পাতা বোজা চোখের তারায় ভয় আর লজ্জা। ইলা বুঝি কেঁদে ফেলবে এইবার। সেন সাহেব তাকিয়ে দেখেন। আর ঠোঁটের কোণায় মিটমিটে হাসি হাসেন সেন সাহেব। যেন মজা দেখছেন। হয়তো মরণ যন্ত্রণায় কাতর হরিণের ছটফটানিও এই চোখেই দেখেন সেন সাহেব। এমনি করেই হাসেন তখনো। লোকটাকে হিংস্র মনে হয়। ভীষণ খারাপ লাগে সমীরণের।

ইলা উঠে যায়। বুঝি প্রাণ খুলে কাঁদতে চায় ইলা।

সেন সাহেব আবার হেসে ওঠেন। এই মুহূর্তে ভীষণ রহস্যময় আর দুর্বোধ্য লাগে লোকটাকে। ওদের পিতা-পুত্রীর সম্পর্কটাকে মনে হয় কেমন ঠুনকো আর ঘোরালো। ভারী খারাপ লাগে। অসহ্য মনে হয় সেন সাহেবকে।

আবার কথা বলেন সেন সাহেব। 'তা, রবিঠাকুরের পরে আবার কবিতা কী? কী লিখবে তোমরা? কি-ই বা জানো?' মুখে-চোখে দারুণ এক তাচ্ছিল্য সেন সাহেবের। বলেন, 'খবরের কাগজের খবর দু'ধার থেকে মুছে দিলেই তো কবিতা হয়ে যায় এখনকার। আমি ওসব কস্মিনকালেও পড়ি না।'

যেন এই শেষ, শেষ আর চরম কথাটাই বলতে এসেছিলেন সেন সাহেব। সমীরণের ভারী ইচ্ছে হয় কিছু বলে। কিন্তু বলে না। শুধু মাথার ভেতরে কী এক জ্বালা অনুভব করে। অপমানে মুখটা বুঝি লাল হয়ে ওঠে। কিছুই বলতে না পারার অসহায়তা ওকে করুণ করে তোলে।

সেন সাহেব বলেন, 'ওসব সাহিত্য ফাহিত্যর ধার ধারিনে আমি। আমার মনে হয় আজকালকার এইসব পদ্য আর গল্পের ছেলেমানুষীকে আমল দেওয়া মানেই বাজে সময় নষ্ট করা। এসব লেখার কোন্ মানে নেই। পড়ারও না।' সেন সাহেব খানিক থামেন। সমীরণের মুখের দিকে তাকান কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলেন, 'তবে একেবারে গণ্ডমূর্খ মনে কর না মাষ্টার। আমিও পড়ি। কাগজের বিজ্ঞাপন। আমার মনে হয় তোমাদের মনগড়া সব প্রলাপের চেয়ে ওর মানে আছে। এবং রসও আছে তাতে। ওগুলোও তো লেখাই মাস্টার। ঐগুলিও কষ্ট করেই লিখতে হয় কাউকে। নিঃসন্দেহে তারাও লেখক।' হা-হা করে হাসতে থাকেন সেন সাহেব। বুঝি নিজেকে বাহাদুর ভাবতেই ভাল লাগে আজ। কিন্তু কী স্বভাব সেন সাহেবের! সমীরণ ভাবে। বড় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলেন সেন সাহেব। যেন সমীরণকে না, তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে শোনাবার জন্যই এত কথা বলা। কিন্তু নিজেকে অপমানিত বোধ করে সমীরণ। সেন সাহেবের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, লোকটা যে কোন মুহূর্তেই যে কাউকে খুন করতে পারে। হ্যাঁ, তাই ভাবে সমীরণ।

সেন সাহেব বলেন, 'না, আমি যাই, আমাকে হয়তো ভাল লাগছে না তোমার।'

সমীরণ এবারেও কথা বলে না। সেন সাহেব উঠে দাঁড়ান। চোখ তোলে না সমীরণ।

—'কিন্তু তোমার ছাত্রী গেল কোথায়?' সেন সাহেব যেন অবাক হন। বলেন, 'ডাকো, ডাকো তাকে।' বলতে বলতে বেরিয়ে যান। পায়ের শ্লিপারে শব্দ নেই। কেমন নরখাদক বাঘের মতই নিঃশব্দ আসা-যাওয়া লোকটার। ইলা কিন্তু আর আসে না। কেন, ভয়ে, না লজ্জায়?

সেন সাহেবের ফোটোটা বুঝি চোখ মেলে দেখা যায় না আর। কিন্তু কোথায় তাকাবে সমীরণ। এ ঘরের সারা দেয়ালেই যে সেন

সাহেবের নানা মূর্তি। ইলার একটা ছবি নেই। ইলার মায়েরও না। সমীরণ চোখ নামিয়ে নেয়। কিছুক্ষণ অর্থহীন চোখে বাইরে তাকিয়ে থাকে। কাচের শার্শির ফাঁকে আবছা অস্পষ্ট হয়ে গেছে সব। ভীষণ অন্ধকার। অন্ধকারের মাতলামি যেন। বাইরে ঝড়। হাওয়া যেন চেঁচাচ্ছে। মেঘ ডাকছে গুড়্-গুড়্। মাঝে-মাঝে চমকে উঠছে আকাশ। এঘরে বসে বাইরে আকাশের চমকানিটুকু টের পায় সমীরণ। শার্শির গা বেয়ে জল পড়ছে। এখান থেকে মুক্তোর মত মনে হয় জলের ফোঁটাগুলি। ঘরের আলোর ছটা লেগে ঝিকমিক করছে। অনেক দূরে আলো জ্বলছে রাস্তায়। আবছা আলোর সংক্ষিপ্ত বৃত্ত ঘিরে চিক ঝুলছে বৃষ্টির। দেখতে দেখতে আবার চোখ বুজে আসে সমীরণের। ঘুম পায়।

এখনো কেউ এল না। ঘরটা নির্জন। বড় একলা লাগে নিজেকে।

সেদিন ইলা বলেছিল, 'জানেন, এ বাড়িতে বেশী দিন থাকা যায় না।'

সুখে থাকতে ভুতে কিলোয়। সমীরণ ভেবেছিল তাই। অবাক হয়ে জিগ্গেস করেছিল, 'তার মানে?'

—'এখানে প্রাণ খুলে কথা বলার লোক পাইনে একটা। বড় একলা লাগে। তার উপরে বাড়িটা বড্ড খারাপ। একটা কথাই যেন বলতে চায় ইলা। যার মানে সে নিজেও বোঝে না। কিম্বা বোঝাতে পারে না কাউকে। বোঝাতে গিয়ে ঠেকে যায়। যেন ভাষা খুঁজে পায় না বলার। ইলাকে বড় করুণ দেখায় তখন। ভীষণ ক্লান্ত মনে হয়। বুঝি কান্নায় গলা বুজে আসে। সমীরণ ভাবে, ইলার বুকে বড় ব্যথা। যা সে নিজেও জানে না। টেবিলের উপরে ইলার প্রসারিত নিটোল, নিভাঁজ হাত দুটির দিকে তাকিয়ে সমীরণ কত কথাই না ভাবে। কিন্তু থমথমে বিষন্ন মুখখানার দিকে একবার তাকাতে পারে না।

কদিন থেকেই দেখছে সমীরণ। ইলা বড় ক্লান্ত। সারা দেহে ওর ক্লান্তি আর অবসাদ। নেশাচ্ছন্নের মত দুটি চোখ। একটুতে হাঁপিয়ে ওঠে যেন। কী যে অসুখ ইলার। ওকে দেখে মায়া হয় সমীরণের। ভীষণ অস্বস্তি। মনে হয়, বুঝি ওর মত অসহায় পৃথিবীতে আর হয় না।

কিন্তু মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছে সমীরণ। ইলা আগের চেয়ে অনেকখানি সুন্দর হয়েছে দেখতে। মুখখানা ভরাট। চোখ দুটি ফোলাফোলা। একটা নিরবচ্ছিন্ন অবসাদ আলস্য হয়ে, আনন্দ হয়ে ওকে ঘিরে রেখেছে। সমস্ত শরীর জুড়ে সদ্য ঘুম থেকে ওঠা জড়তা। বড্ড টেনেটেনে আজকাল কথা বলে ইলা। কতকটা আনুনাসিক।

ইলা বলেছিল, 'জানেন সমীরদা, আমার ভারী ইচ্ছে হয় আজকাল, এখান থেকে কোথাও চলে যাই। অনেকদূরে পালিয়ে গিয়ে বাঁচি।' চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠেছিল। আর আজ এই প্রথম মনে হল সমীরণের ইলার বুকে বড় গভীর এক ব্যথা। বুকের ভেতরে অহরহ যা বয়ে বেড়াতে ভীষণ কষ্ট হয় ইলার। নিজের অজ্ঞাতসারেই আজ বুঝি ইলার জন্য সমীরণের মনটাও টনটনিয়ে উঠেছিল।

তবু সমীরণ বলেছিল, 'ইলা, আমি জানিনে কী তোমার ব্যথা। কিম্বা দুঃখ তোমার বিলাস কিনা তাও জানা নেই। জানতে চাওয়াটাও আমার পক্ষে অশোভন। কয়েকটা টাকার লোভে এখানে আসা আমার। ধরতে গেলে মধুর চেয়ে তোমার বাবামায়ের কাছে আমার মূল্য খুব উঁচু না। সেই জন্যে তোমার কষ্টকে বুঝতে যাওয়ার মানেই তোমাদের ঘরের খবর জানতে চাওয়া। আমার মত সামান্য প্রাইভেট টিউটারের পক্ষে সেটা কি ধৃষ্টতা নয়?'

ইলা চুপ করে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকে সামনে। বুঝি সংকোচে আড়ষ্ট হয়ে যায়। শেষে আস্তে আস্তে বলে, 'ছি-ছি! মধু আর আপনি! অমন করে কে আপনাকে ভাবে, আমি?'

—'তোমাকে তো বলছিনে। তোমার বাবা মায়ের কথাই বলছি।

ওঁরা তোমার অভিভাবক। যাকে তুমি অত্যাচার ভেবে কষ্ট পাচ্ছ আসলে তা হয়তো শাসন। যা ভাল না বাসলে করা যায় না। যে বন্ধন থেকে তুমি মুক্তি চাইছো সেই মুক্তি যে এই বন্ধনের চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক তা হয়তো তোমার জানা নেই ইলা।' সমীরণ থামে। অপলক ইলার থমথমে মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকে।

ইলা এবার হাসে। ঠোঁট উল্টে বলে, 'শাসন! কে শাসন করবে আমাকে? ওরা? তা হলেই হয়েছে।' যেন পরম ঘৃণায় মুখখানা বিকৃত করে ইলা। 'সমীরদা, হজরত মহম্মদের সেই ছেলেটাকে সন্দেশের লোভ ছাড়ানোর গল্প না বলেছিলেন একদিন? আমার মনে আছে তা। তাই আমাকে শাসন করার আগে নিজেকে কেন শাসন করে সংযত করবার চেষ্টা করে না ওরা?'

—'ইলা ওঁরা তোমার গুরুজন।' যেন ধমক দেয় সমীরণ।

—'ছাই!' চাপা রাগ যেন ফেটে পড়ে ইলার।

—'তোমার কী হয়েছে বল তো?' সন্দিগ্ধ চোখে ইলাকে দেখে সমীরণ।

ইলা এইবার ভয় পায়। অতি সংকোচে জড়-সড় হয়ে বসে। আঁচলটা ভাল করে জড়িয়ে নেয় সারা শরীরে। যেন এই মুহূর্তে কর্পূরের মত শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারলে ও বাঁচে। ইলার মুখেচোখে ভীষণ এক আতংক। চোখ দুটো ছলছল করে। ও বুঝি কাঁদবে।

সমীরণ কী ভাবে। শেষে বলে, 'আজ আর পড়া হবে না। শরীরটা ভাল লাগছে না আমার। চল, কিছু দূর বেড়িয়ে আসি না হয়।'

ইলা এবার উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে, 'চলুন।'

সমীরণের সঙ্গে বেরিয়ে যায় ইলা। আপত্তি করে না কেউ। আজকাল তাই এমনি করে মাঝে-মাঝে অনেক দূরে চলে যায় ওরা।

বাইরে এসে ইলা বলে, 'জানেন সমীরদা, ওবাড়িটায় মানুষ হয়ে বাঁচা যায় না। আপনার দম বন্ধ হয়ে আসে না ওখানে?

—'না তো !' অবাক হয়ে ইলার মুখের দিকে তাকায় সমীরণ।

চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায় সমীরণ। বেশ কয়েক পা পেছনে পড়ে গেছে ইলা। এইটুকুতো পথ। তবু ইলা যেন হাঁপিয়ে উঠেছে এতেই। সমীরণ জিগেস করে, 'কী হয়েছে তোমার ইলা ?

ইলা সমীরণের চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পায়। কেমন অসহায় এবং ফ্যাকাসে দেখতে মুখটা। শুকনো ঠোঁটে ঠোঁট চেপে যেন ভেতরের কী এক যন্ত্রণাকে রুখবার চেষ্টা করে ইলা। বলে, 'হাঁটতে পারছি না। একটা রিক্সা ডাকুন।' রিক্সায় গেলে আবার পুরনো প্রশ্নই করে সমীরণ, 'কোথায় চলেছি বল তো ? কী হয়েছে তোমার ?'

ইলা যেন শোনে না। শুনতে পায় না কিছুই। মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে। আনমনা কত কি ভাবে। হয়তো এড়িয়ে যেতে চায় সমীরণের কথাটা। এতক্ষণে ইলার মনের কথাটা বুঝি টের পায় সমীরণ। তাই প্রশ্ন করে না। অন্য কথা বলে, 'বিকেলে বিকেলে একটু বেড়ানো ভাল। গঙ্গার ধারে যাবে ইলা ?'

ইলা এবার ফিরে তাকায়। সমীরণ আশ্চর্য, অভিভূত চোখে তাকিয়ে থাকে। নরম গলায় ধীরে ধীরে শুধায়, 'তুমি কাঁদছিলে ইলা।'

—'পারিনে নিজেকে রুখতে। কী যেন হয়েছে আমার। মানুষের সঙ্গ আর ভাল লাগে না। সহ্য করতে পারিনে কাউকে। মনে হয় সবাই আমার শত্রু। আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে সবাই। ইচ্ছে হয় একলা থাকি। প্রাণ খুলে চেঁচিয়ে কাঁদি কেবল। কেন এমন হয় বলুন তো ?' কান্না ভেজা গলায় ইলার কথাগুলি প্রলাপের মত শোনায়।

সমীরণ বলে, 'তোমার ঘুম হয় না রাত্রে ?'

ইলা বলে, 'না। বুকটা ধড়ফড় করে কেবল। দম আটকে আসে মাঝেমাঝে। তখন মনে হয়, আর বুঝি বাঁচবে না। মরে যাবো এইবার।'

—'ডাক্তার দেখাও না কেন তবে ?'

—'কে দেখাবে ?'

—'কেন তোমার মা-বাবা ?'

ইলা আবার মুখ ফেরায়। চুপ করে থাকে। শুধু চাপা ঠোঁটের কোনে এক টুকরো হাসি ফুটিয়ে রাখে কষ্টের। কিন্তু কাঁদে না।

সমীরণের অস্বস্তি লাগে। রিক্সাটা এগিয়ে যায়।

হঠাৎ চমকে ওঠে দু'জনেই। চলন্ত রিক্সাটার পাশেই সেন সাহেবের মোটরটা জোর ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ে। গাড়ি থেকে মস্ত মুখখানা বের করে তাকান সেন সাহেব। দু'চোখ উছলে পড়া অকপট হাসি। 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে দুটিতে?' সেন সাহেবের সহাস্য প্রশ্ন। সমীরণ খুশি হয় এবার। বলে, 'একটু বেড়াতে বেরিয়েছি।'

—'বেশ, বেশ!' যেন তারিফ করেন সেন সাহেব। ফের স্টার্ট দেন গাড়িতে। মুহূর্তে উধাও হয়ে যান।

কিন্তু ইলা যেন কি! রাগে ফেটে পড়তে চায় যেন মেয়েটা। এই অকারণ আগুন হবার মানে বোঝে না সমীরণ।

অর্ধবৃত্ত পার্কটা এখন অন্ধকার। এদিকটা নির্জন। নিচে কুলুকুলু গঙ্গা। ছোটছোট ঢেউ। অন্ধকার আকাশের একটি তারা অসংখ্য হয়ে জ্বলছে। জর্দা বরণ নদীকে মনে হচ্ছে চুমকি দেয়া শাড়ি। অনেকক্ষণ পরপর দু'একটা নৌকার ছপ ছপ্ যাওয়া আসার শব্দ শোনা যায়। নইলে এমন অন্ধকারে নদীর অস্তিত্ব বোঝা ভার।

অন্ধকার পার্কের এই কোনটা ফাঁকা। কেমন একলা। অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে গুটি কয়েক মানুষের জটলা। এখানটা বেশ অন্ধকারে বোঝা যায় না কিছুই। দুটি মানুষকে চেনা যায় না। রিক্সা থেকে নেমে ইলাই বেছে নিয়েছে জায়গাটা।

প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে বসেছিল দুটিতে। চুপ-চাপ। অনেকক্ষণ কেটে গেছে তারপর। অনেকগুলি সেকেণ্ড-মিনিট পেরিয়ে এখন ঘণ্টা ছুঁই-ছুঁই। তবু কথা নেই কারো মুখে। যেন বোবা হয়ে গেছে দু'জনেই। এখানে এসে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। যে কথা বলবো বলে আজ এত দূরে এসেছে ইলা, এখন সহস্র সঙ্কোচ এসে তাই বলতে দিচ্ছে না। আর যে কথা শুনবো বলেই ঘর থেকে বাইরে, এত দূরে

ইলাকে নিয়ে এসেছে সমীরণ, কী এক দ্বিধা এসে সেই আগ্রহের মুখে বার বার হাত চাপা দিতে চাইছে এইবার। মনে মনে ছট্ ফট্ করছে দু'জনেই। অস্বস্তি বোধ করছে ভীষণ।

দুই হাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে ঘাসের ওপর আধশোয়া হয়ে সামনে তাকিয়ে ছিল সমীরণ। ইলা বাঁ পাশে। হঠাৎ বুকের ওপর ঝুকে পড়ে সমীরণের ডান কাঁধের উপর হাতখানা রাখে ইলা। বুকটা কেঁপে ওঠে সমীরণের। কথা নেই মুখে। বলার শক্তি নেই যেন। কেবল রুদ্ধনিঃশ্বাস কি এক ভয়ংকর মুহূর্তের প্রতীক্ষা করে সমীরণ। ইলা কিন্তু কাঁপে না। বড় স্থির, শান্ত এবং অবিচল মনে হয় ইলাকে। সমীরণের ভয় হয় আরো।

কিন্তু না। আর বেশিদূর এগোয় না ইলা। এবার কথা বলে। 'ভয় করছে ?'

—'না।' দৃঢ় হতে চায় সমীরণ। গলাটা তবু কেঁপে যায়। বুঝি টের পায় ইলা।

—'সত্যি করছে না ?' আশান্বিতের মত শোনায় ইলার গলাটা।

—'কেন করবে ভয় ?' সমীরণের জিজ্ঞাসা। নির্ভীক, অকম্প্র মনে হয় এইবার।

ইলা বলে, 'তবে চল, এখান থেকে পালাই।'

অন্ধকারে দেখে না ইলা। দেখতে পায় না কিছুই। কিন্তু সমীরণের কপালে এই মুহূর্তে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা দুশ্চিন্তার রেখা ফোটে কয়েকটি। সন্দেহ ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে সমীরণ, 'কোথায় ?'

ইলা বলে, 'যেখানে গেলে সব কথা খুলে বলতে পারবো তোমাকে। তুমি না আমার সব কথা শুনতে চাও ? চল, যাবে ? অন্ধকারে সমীরণের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ইলা।

কে যেন আসছে। এদিকেই। সমীরণ বেঁচে যায়। উত্তর দেবার হাত থেকে রেহাই পায়। অন্তত এই মুহূর্তে কঠিন কিছু বলে আঘাত করার প্রয়োজন হয় না ইলাকে।

মানুষের সাড়া পেয়ে সমীরণের কাঁধ থেকে হাত নামায় ইলা। বুকের ওপর থেকে সরে যায়।

সমীরণ বলে, 'কয়েক দিন আগেই জ্বর থেকে উঠেছ। আর বেশিক্ষণ ঠাণ্ডায় থাকা ভাল না। চল ইলা ওঠা যাক।'

বিপদনাশিনী কি দেখেছিলেন কে জানে! কিন্তু ছেলেকে সাবধান করে দিয়েছিলেন সেদিন। বলেছিলেন, 'কী করছিস তুই! দুনিয়াসুদ্ধ লোকের চাকরি হয়, আর তোর হয় না কেন বল তো?' বেশ অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছিল মাকে।

হেসেই জবাব দিয়েছিল সমীরণ, 'সত্যি, কেন হয় না বলতো?' মাকে উল্টো প্রশ্ন করে ছেলে।

কথা শুনে বুঝি ক্ষেপে যান বিপদনাশিনী। বলেন, 'কেমন করে হবে। সেন সাহেবের বাড়িতে তোকে বেগুণ পাতায় ভাত খাইয়েছে।'

—'তার মানে!' সন্দিগ্ধ চোখে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিল সমীরণ।

মানে বেশ প্রাঞ্জল করেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বিপদনাশিনী। বলেছিলেন, 'ওসব ছাত্রী পড়ানো আমার ভাল লাগে না বাপু। মেয়েটাকে আর আগের মত ভাল মনে হয় না। ও মেয়ে সর্বনাশী। কুলের কলঙ্ক। আজ ওকে দেখে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। স্পষ্ট করে না বললেও আকারে ইঙ্গিতে আসতে বারণ করে দিয়েছি এখানে। তুই এবার উঠে পড়ে লাগ দেখি। কাজের চেষ্টা কর। এসব জাত যাওয়া পেট-অভরা কাজ ভাল না।'

সমীরণ বোঝে না। কিন্তু এক প্রচ্ছন্ন আতঙ্কে যেন সমস্ত শরীর মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে ওর।......

ঝন-ঝন করে শব্দ হল ভেতরে। কী একটা ভাঙ্গল যেন। কাপ-ডিশ কাচের বাসন কিছু একটা। ভাবনার সুতোটা ছিঁড়ে যায়। চেয়ারের

উপরে পা তুলে গুটি-সুটি হয়ে বসেছিল সমীরণ। এবার পা নামায়। ভয়ে ভয়ে উৎকর্ণ হয়ে থাকে আরো কিছু শোনার আশায়। এত রাত্রে এ বাড়িতে চোর ঢুকেছে নিশ্চয়ই। নইলে শব্দ করবে কে? বেড়াল? তাও হতে পারে। কিন্তু বুকের ভেতরে কাঁপন শুরু হয়েছে। সমীরণ কাঁপছে। ভয় পেয়েছে। কিন্তু এ বাড়ির লোকগুলি কী? এতবড় শব্দ অন্তত একজনেরও কি শুনতে নেই? সমীরণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। ইচ্ছে হয়, ভেতরে যায় দেখে। চিৎকার করে জাগিয়ে তোলে সবাইকে। কিন্তু পারে না। সাহস হয় না যেতে।

এ যেন ঘুম না। মরে আছে সবাই। সেন সাহেবের বাংলোটা একটা কবরখানা। নির্জন, শীতল এবং ভয়াবহ। একা সমীরণ রাত জাগছে। মৃত্যুপুরী পাহারা দিচ্ছে। বাইরে অন্ধকার। ঝড়! বৃষ্টির অঝোর কান্না অসহায় পৃথিবীটা কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে। থেকে থেকে ভ্রূকুটি-কুটিল আকাশটা চমকাচ্ছে। ধমকাচ্ছে পৃথিবীটাকেই। সমীরণ এঘরে একলা। এই সেন সাহেবের বাংলোয়। সে ভয় পেয়েছে। ঠক-ঠক করে কাঁপছে শীতে।

ভেতরে চাপা গলার ফিস-ফিস শব্দ, না। চোর বেড়ালও নয়। কে যেন কাঁদছে। শাসাচ্ছে কাকে। মেয়েলি গলা। পুরুষ কণ্ঠ গম্ভীর এবং মৃদু। সমীরণ কান পাতে। টের পায় এবার। কণিকা সেন কাঁদছেন। শাসাচ্ছেন কাকে। কাকে? সেন সাহেবকেই। শব্দ কিসের? কী ভাঙল? এত রাত্রে কী হয়েছে ওঁদের? ঘুম নেই?

এমনি করে কাপ-ডিশটা ভেঙে গিয়েছিল সেদিন। এমনি করেই শব্দ হয়েছিল। হাসতে-হাসতে টিপয়ের উপরে ঝুঁকে পড়েছিলেন কণিকা সেন। টিপয়টা উল্টে গিয়েছিল। ভেঙে চুর-চুর হয়েছিল কাপটা। ডিশখানা আধখানা। একটুও আপশোস করেননি তাতে। হাসি থামেনি। শুধু সামনে বসে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে গেলেন মিঃ উকিল। সমীরণকে দেখে অপ্রস্তুত। উঠে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন মিঃ উকিল। উঠি উঠি করছিলেন সমীরণকে দেখে। কিন্তু খপ করে

হাতটা চেপে ধরেছিলেন কণিকা সেন। টেনে বসিয়ে দিয়েছিলেন চেয়ারে। সমীরণের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই বলেছিলেন, মিঃ উকিল, এই কি যাবার সময় হল আপনার?' বুঝি অভিমানে ঠোঁট দুটি ফুলেও ওঠে কণিকা সেনের।

মিঃ উকিলকে মনে হয় বড্ড অসহায়। বলেন, 'না, উঠি এবার। কাজ পড়ে আছে অনেক। অফিসেও যেতে হবে একবার।' মিঃ উকিলের চোখ দুটো সমীরণকেই দেখে। ভীষণ লজ্জা পেয়েছেন যেন।

কণিকা সেন লক্ষ্য করেন সব। তারপর তাচ্ছিল্যভরে বলেন, 'আপনি ভারী ভীতু।' উকিলের দিকে চেয়ে মিটি-মিটি হাসেন কণিকা। বলেন, 'ও কিছু না। ইলার জন্য রাখা হয়েছে ওকে।' শেষে সমীরণের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছেন? ভেতরে যান আপনি।' গলায় অপূর্ব ঝাঁঝ ছিল কণিকার।

অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সমীরণ। কিছুই দেখছিল না। শুনছিল সব। আর মনে মনে আশ্চর্য হচ্ছিল। অদ্ভুত লাগছিল কণিকা সেনকে। নতুন মনে হচ্ছিল। সমীরণের সম্পূর্ণ অচেনা।

কথা শুনে হকচকিয়ে গিয়েছিল সমীরণ। কণিকা সেনের দিকে ফিরে তাকিয়েছিল।

কণিকা সেন ফিরে দেখেন না। আর লক্ষ্য করেন না সমীরণকে। দরজার দিকে তাকিয়ে ডাকেন, 'মধু!'

—'ইলাকে ডেকে দে!'

মধু চলে যায়। সমীরণ অনুসরণ করে তাকে। ছোট্ট লনটুকু পেরিয়ে বাংলোর বারান্দায় পা রাখে।

কিন্তু বারান্দায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সমীরণ লক্ষ্য করে সব। সব কথাই শুনতে পায় ওঁদের।

মিঃ উকিলকে আবার স্বাভাবিক মনে হয়। কণিকা সেনকে উচ্ছ্বসিত।

কণিকা বলছিলেন, 'আমি সব বুঝি। কিন্তু আপনাদের বুঝি না।'

কথা শুনে হেসে উঠেছিলেন মিঃ উকিল। প্রশ্ন করেছিলেন, 'বহুবচন করছেন আর কাকে নিয়ে?'

—'আপনি আর আপনাদের সেন সাহেবকে নিয়ে। সত্যি, কী বলুন তো আপনারা?' প্রশ্ন করেন কণিকা।

'কেন? কী অপরাধ হল আবার?' হেসে কণিকার মুখের দিকে তাকান মিঃ উকিল।

—'বড্ড পাষাণ আপনারা।' যেন গম্ভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কথা বলেন কণিকা।

—'তা মিলিটারী ম্যানদের একটু না হলে চলে না।' আত্মপ্রসাদের হাসি হাসতে হাসতে চকচকে টাক-পড়া মাথায় হাত বোলাতে শুরু করেন মিঃ উকিল। হাসি থামিয়ে এবার অন্য কথা পড়েন মিঃ উকিল, 'ছবি দেখেছেন এ সপ্তাহে?'

—'হ্যাঁ, 'সমুদ্র সৈকতে' দেখলাম। আচ্ছা তরুণকুমার লোকটা কি বলুন তো?' উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রশ্ন করেন কণিকা সেন।

উকিল অবাক হন। বলেন, 'কেন?'

—'ওঁর কি বুড়ো হতে নেই? বয়স তো পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই। কিন্তু চেহারা দেখেছেন? যেন পঁচিশ বছরও না। আমার চোখেই ওঁর জীবনে কত মেয়েকে নায়িকা সেজে বুড়ি হয়ে যেতে দেখলাম। অথচ এই লোকটা যেই সেই। এখনো নায়ক। দেখে মনে হয় যৌবনের উপর ওঁর ভোগ দখলের সত্ব যেন আমরণ কালের। ব্যাপার কি বলুন তো? দেখে অবাক লাগে না আপনার? কণিকা সেন সপ্রশ্ন চোখ দুটি মিঃ উকিলের মুখের উপর রাখেন।

উকিল হাসেন। বলেন, 'দেখুন যৌবন বলুন আর তার তেজই বলুন, বয়সের হিসেবে ও জিনিসের বাড়তি-কমতি নেই। আসলে ওটা মানুষের অভ্যাসের যোগফল। যৌবনকে টিকিয়ে রাখাই বড় কথা। ওসব মানুষের সাধনার ধন। সবাই ধরে রাখতে পারে না। মেয়েদের তো সে ক্ষমতা নেই-ই। তাই দুদিনের নায়িকা সেজেই ওরা ফুরিয়ে

যায়। খুঁজলে চিরদিনের নায়ক আপনি অনেক পাবেন। কিন্তু নায়িকা একটিও না।' বেতের টেবিলের ওপর নিজের বলিষ্ঠ পেশীবহুল হাত দু'খানা রাখেন মিঃ উকিল। সেই প্রসারিত দুটি হাতের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসেন কণিকা। বলেন, 'তাই বলে আপনারা সে জাতের পুরুষ নন মিঃ উকিল।'

—'বটে, পরীক্ষা দিতে হবে নাকি?' উচ্ছ্বসিত হয়ে চেয়ারে বসেন মিঃ উকিল। দু'হাতের শক্ত থাবায় চেয়ারের হাতা ধরে কণিকার চোখের উপর স্থির দৃষ্টি তুলে তাকান।

—'রক্ষে করুন স্যার, আপনার দানবীয় উল্লাস সহ্য করার শক্তি নেই আমার।' হাত জোড় করে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠেন কণিকা সেন।

কোথা থেকে এসে সামনে দাঁড়ায় বিজয়। কণিকা সেন অস্বস্তি-বোধ করেন যেন। মোটা লেন্সের চশমার ফাঁকে বড় করুণ হয়ে জ্বলছে বিজয়ের ক্ষীণ-দৃষ্টি চোখ দুটো। কণিকা বুঝি চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তাড়া দেন মিঃ উকিলকে। 'এখানে না, ভেতরে চলুন মিঃ উকিল।'

ওঁরা উঠে দাঁড়ান।

বিজয় বলে, 'ভগবানদাসের ওখানে যাওয়ার কথা ছিল তোমার।' যেন স্মরণ করিয়ে দেয় কথাটা। ওঁরা এগিয়ে যান। বিজয় পিছু নেয়।

পেছনে তাকান কণিকা সেন। বুঝি বিরক্ত হন বিজয়কে দেখে। বলেন, 'আমি যাবো না। তুমি যাও বিজয়। মাথাটা বেজায় ধরেছে আমার।' দুই আঙুলে মাথাটা টিপে ধরেন কণিকা।

বিজয় বলে, 'এত কথা বলছো কেন তবে? শোবে চল। আমি মাথা টিপে দেবো।'

কণিকা সেন জ্বলে ওঠেন। বিজয়ের কথা শুনে ভীষণ রেগে ওঠেন যেন। 'আমাকে জ্বালিও না বিজয়। ভাল লাগে না। কতদিন না বলেছি, তুমি অমন করে আমার পেছনে ঘুরবে না?'

—'চেঁচিও না। মাথাধরা তাতে আরো বেড়ে যাবে।' অবিচল কণ্ঠে অনুনয়ের সুর ফোটায় বিজয়। উপদেশের মত শোনায় কথাগুলি।

কণিকা সেন এবার চীৎকার করেন। 'না, মাথা-টাথা আমার ধরেনি। মিথ্যে কথা ওসব। তুমি যাও বিজয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসভ্যের মত হেসো না। সহ্য করতে পারিনে আমি।' কণিকা সেনের বুকটা মৃদু ওঠানামা করে। যেন এইটুকু কথা বলতেই হাঁপিয়ে উঠেছেন বেশ।

বিজয় তবু নড়ে না। দাঁড়িয়ে অপলক চোখে কণিকাকেই দেখে। চাপা ঠোঁটে বিজয় বিজয়ের হাসি হাসে যেন। নির্বিকার ভঙ্গিতে আঙ্গুলের ডগায় রিংয়ে বাঁধা চাবির চেনটা ঘোরায়।

দাঁতে দাঁত চেপে কট্-কট্ করে তাকান কণিকা সেন।

মিঃ উকিল কথা বলেন এবার, 'না, আমি যাই মিসেস সেন।'

আর এক মুহূর্ত দাঁড়ান না। কারো মুখের কোন কথা শোনার অপেক্ষাও করেন না মিঃ উকিল। গটগট করে বিজয়ের পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যান। তারপর গাড়ি নিয়ে ছুটে পালিয়ে যান।

কয়েক সেকেণ্ড স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দুজন। মুখোমুখি। চোখা-চোখি। স্থির অপলক দৃষ্টিতে দু'জন দু'জনকে দেখে। তারপর নিঃশব্দে পাশাপাশি ঘরে ঢোকে দুজন। বিজয় আর কণিকা সেন।

আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শোনা যায়। আড় চোখে সব দেখে সমীরণ। মনটা তাই বিষিয়ে ওঠে। বিরূপ হয়ে ওঠে এবাড়ির সব কিছুর উপর। কেমন কদর্য, কুৎসিত এবং অস্পষ্ট মনে হয় এ বাড়ির সবাইকে। সব কিছুই মনে হয় অশালীন।

ইলা হয়তো লজ্জা পেয়েছিল সেদিন। ভয়ংকর কাতর এবং সংকুচিত মনে হচ্ছিল ইলাকে। বেশ কুণ্ঠা সহকারেই বলছিল, 'দেখে অবাক হয়েছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু এ আমি অষ্টপ্রহরই দেখে থাকি। চোখ-সওয়া হয়ে গেছে এখন। এখন আর অবাক হই না। ভাবি, পর্দায় ছবি দেখছি যেন। যার ভঙ্গী ছাড়া সবটুকুই মিথ্যে।' কথা বলছিল ইলা। কিন্তু ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল চোখ-মুখ। সমীরণের ভাল লেগেছিল। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল একমাত্র এই মেয়েটাই এ বাড়িতে খাঁটি। আর কেউ না। সবাই ভঙ্গী। মধু পর্যন্ত। ইলার কথাই ঠিক।

মিঃ উকিলের কথা শুনেছিল পরে। সেন সাহেবের কথাও। না, ইলা বলেনি সমীরণকে। অন্য কেউ। কে যেন বলেছিল, একই রেজিমেণ্টে দুই অফিসার ছিলেন ওঁরা। পুনায়। একজন ক্যাপ্টেন সেন। অন্যজন মিষ্টার উকিল। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি। জাপানীরা ঘাঁটি গেড়েছে বর্মায়। কলকাতায় পড়েছে বোমা। সময়-অসময় নেই। বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষ। অন্নচিন্তায় চমৎকার মানুষ। মানুষ জন্মাচ্ছে। হিসেব রাখলে না খেতে পেয়ে মরছে তার বেশী। শহর গাঁয়ের পথে ঘাটে পা ফেলা বিড়ম্বনা। কিলবিল করছে না খেতে-পাওয়া মরা আর আধমরা মানুষের দঙ্গল। গা ঘিনঘিন করে দেখে। চোখে জল আসে লঙ্গরখানার পাশ দিয়ে যেতে। ভেবে অবাক হতে হয়, দেশে এত মানুষও ছিল! যুদ্ধের আগে খেয়ে পরেই বেঁচেছিল এরা! এদিকে স্পেশাল ট্রেনে চেপে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলেছে সৈন্যবাহিনী। মিত্র শক্তির পরম সহায়। যুদ্ধের দৌলতে এক একজন নবাব বাদশা। মুখে চোখে অভাব অনটনের চিহ্ন নেই কোথাও। চাষী সজ্জনেরা কপাল চাপড়ে হায় হায় করছে। ক্ষুদে কারবারী সাজছে মস্ত মহাজন। এক একজন লাট বেলাট। মানুষ একটা নতুন শব্দ শিখেছে, ব্ল্যাক মার্কেট। আভিধানিক অর্থ যার কালো বাজার। নিন্দুকের কথা আলাদা। তারা বলছে, চোরাবাজার। শহর প্রায় ফাঁকা। প্রাণের মায়ায় জুটছে এসে গ্রামে। গোয়াল ঘরখানার মাসিক দাম পনের টাকা। সাতপুরুষে যা কেউ ভাবেনি। রাত্রে অন্ধকার শহর। জুজুর ভয়ে আলোর আধখানা চোখ বোঁজা।

গোদের উপরে বিষ ফোঁড়া উঠেছে আবার। ওদিকে বর্মা মুলুকে জাপানীদের তাড়া খেয়ে বেনো জলের মত মানুষ এসে ঢুকছে এদেশে। যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। পায়ে হেঁটেই পাড়ি জমিয়েছে সবাই। দুর্গম বন পাহাড়ের নিষেধ মানছে না। সাহস যেন শতগুণ হয়েছে মানুষের। মরার চেয়ে জীবনের মূল্য বুঝেছে বেশী!

হুঁশিয়ার এদেশের সরকার। আসাম সীমান্তে কড়া খবরদারীর

ব্যবস্থা রেখেছেন। বন কেটে সাফ করে ক্যাম্প বসেছে। রাতারাতি মোতায়েন করা হয়েছে মিলিটারী। পথে পথে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে মিলিটারী পুলিশ আর জীপ। ক্যাম্পের ভেতরে চলেছে যজ্ঞিবাড়ির ব্যাপার। তেল ঘিয়ের শ্রাদ্ধ। চাল চিনির মা বাপ নেই। এরা বাঁচলে রক্ষা পাবে দেশ। নইলে নির্ঘাৎ রসাতল। কাঁটাতারে লক্ষণের গণ্ডী তৈরী হয়েছে। এপারে ওপারে বিচ্ছেদ। কান সজাগ। চোখ খোলা। বেনো জলের সঙ্গে খড়কুটোর মত দু'একটা জাপানী চর ঢুকে না পড়ে এদেশে। তা হলে সর্বনাশ। মনে মনে ভয়ও কম না।

এ হেন দেশের অবস্থা। মিঃ উকিল আর ক্যাপ্টেন সেন তখন বহাল তবিয়তে, দিব্যি আরামে পুনা ক্যাম্পে বসে দিনকে রাত বানাচ্ছেন, রাতকে দিন। কাজে যা না পারেন, মুখে করছেন তার চেয়ে বেশী। কথায় কথায় উজির আমীর বধ করে চলেছেন হরদম। সুবিধে এই, জাপানীরা শুনছে না। কানে যাচ্ছে না এই দুই বঙ্গ-পুঙ্গবের কথা। নইলে পৃথিবী থেকেই উৎখাত হবার পরিকল্পনাটা পুরোপুরি মেনে নিত কিনা বুদ্ধ-ভক্তেরা বলা মুশকিল।

এমন সময় বিচ্ছেদের বাঁশি বেজে উঠল। ডাক পড়ল দু'জনেরই। কলকাতায় গেলেন মিঃ উকিল। আসাম সীমান্তে সেন সাহেব। সেই বিচ্ছেদের মুহূর্তটি কতখানি করুণ আর রাজকীয় হয়ে উঠেছিল, বলা যায় না। কারণ সমীরণ তা শোনেনি। বর্ণনা করে কেউ বলেনি তাকে।

মাঝখানে কয়েকটা বছরের খবর কেউ রাখেনি। সম্ভব হয়নি রাখা। ইতিমধ্যে দিন-দুনিয়ার হালচাল বিলকুল পাল্টে গেছে। মহাযুদ্ধের পরে এখন শান্তি পর্বের হাওয়া বইতে শুরু করেছে দেশে। ঘরে ঘরে স্বজন হারানোর কান্না। ইংরাজের বুঝি তখন ভাঁড়ে মা ভবাণী। পুরো দু'শোটি বছরও নিশ্চিন্তে রাজত্ব করা হল না। পাণ্ডবের মহাপ্রস্থানে না, তল্পিতল্পা গুটিয়ে সমুদ্রেও না, আকাশ পথেই

পাড়ি জমালেন এবার। এদেশের মায়া তবে ছাড়তে হল এতদিনে। কিন্তু রাজ্যভার পরীক্ষিতের হাতেই দিয়ে গেলেন। এতকালের দেশ-সেবকেরা দেশ-শাসক হলেন এইবার। সে আর এক মহাভারত।

ভোল পাল্টে গেল সব কিছুর। স্বাধীন দেশে ভোজবাজির মত ঘটনা ঘটতে লাগল রোজ। সমীরণ পাশ করল পর পর গোটা তিনেক। বেকার হয়ে দরজায় দরজায় হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগল চাকরির আশায়। কা কস্য পরিবেদনা। চাকরি আর হয় না। তারপর এই। ত্রিশ টাকা মাস মাইনের গোটা একটা চাকরিই জুটে গেল শেষে।

আবার দেখা হল। মিস্টার উকিল হলেন এখানকার জাতীয় রক্ষী বাহিনীর সর্বেসর্বা। সেন সাহেব ওয়্যারলেস সেণ্টারের। আশ্চর্য হলেন দুজনেই।

•

বাইরে কোথায় একটা কুকুর ডেকে উঠে। কান্নার মত ডাকটা। এই বৃষ্টিতে বুঝি ভিজছে কোথাও। নিরাশ্রয় কুকুরটা কাঁদছে। কাঁপছে শীতে। কেঁউ কেঁউ শব্দটা তাই কাঁপা আর ভয়ার্ত মনে হয়। সেন সাহেবের পোষা পিকিনীজটার কথা মনে পড়ে এইবার। ঐটুকু কালো কুকুরটা সমীরণের চেয়েও সুখী। সুখী এবং ভাগ্যবান। সমীরণের তাই মনে হয়।

সেন সাহেব বলেছিলেন মিঃ উকিলকে, 'জানো, মরবার আগে আমার প্রপার্টির একটা পোর্শান কার নামে উইল করবো?'

উকিল বলেছিলেন, 'কার নামে?'

—'জীম, আমার এই কুকুরের নামে।' বলে আদর করে চুমো খেয়েছিলেন জীমের গালে। সেই কুকুরটা হয়তো পরম আরামে সেন সাহেবের পাশেই ঘুমোচ্ছে এখন।

সমীরণ শীতে কাঁপছে। বাইরে কাঁদছে কুকুরটা। আর একটা জ্যান্ত পরিহাসের মতই ভেতরে ঘুমোচ্ছে জীম। সেন সাহেবের অতি আদরের পিকিনীজ। মানুষের চেয়েও দামী এবং সুখী সেই কুকুরটা।

সেদিন। হঠাৎ এঘরে এসেছিলেন সেন সাহেব। পেছনে পিকিনীজটা।

সেন সাহেব বলেন, 'মাষ্টার তো বেশ লেখ হে।' কুকুরটাকে আদর করতে করতে যেন অন্যমনস্কভাবে কথা বলেন সেন সাহেব।

সেন সাহেবের মুখে প্রশংসা। ভূতের মুখে রাম নাম। সমীরণ ভয় পায়। অবাক চোখে দেখে সেন সাহেবকে। কিছুই বলে না। সেন সাহেব এবার স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বলেন, 'না, না লজ্জা পাবার কী আছে? বেশ হাত তোমার। দেখলাম ক্ষমতা রাখো তুমি লেখার। কোথায় যেন সে দিন পড়লাম তোমার গল্পটা।' সেন সাহেব এবার কাগজের নামটা মনে করবার চেষ্টা করেন বুঝি। চোখ বুজে ভাবেন।

সমীরণ আশ্বস্ত হয়। হেসে বলে, 'ভুল করেছেন। আমি গল্প লিখিনে। অন্য কেউ হবে হয় তো।'

একটু অপ্রস্তুত বোধ করেন হয়তো সেন সাহেব। কিন্তু বিচলিত হন না। বলেন, 'তা হবে হয়তো কিন্তু বেশ লিখেছে। দেখলাম, না মন্দ লেখেনা এখনকার ছেলেরা।' সেন সাহেব খানিক থামেন। শেষে বলেন, 'তোমাদের রবিঠাকুরের জন্ম দিনটা যেন কবে মাষ্টার?'

সমীরণ বলে, 'পঁচিশে বৈশাখ।'

—'তা এসেই তো গেল! ধর আর একমাসও বোধ করি নেই, এ্যাঁ?' সপ্রশ্ন চোখে সেন সাহেব সমীরণের দিকে তাকান। উদার হাসি হেসে ফের প্রশ্ন করেন, 'বাংলা মাসের আজ কত তারিখ মাস্টার?'

—'আজ দশ তারিখ বৈশাখের।' নিরীহ জবাব সমীরণের।

—এ্যাঁ, বল কি! আর তবে পনেরটা দিনও বাকি নেই! যেন আঁতকে উঠেছিলেন সেন সাহেব। চোখ বড় বড় করে তাকিয়েছিলেন সমীরণের দিকে। কেরাণীর দরজায় যেন কাবুলির পাহারা বসেছে। 'কোথাও ফাংসন-টাংসান করছো না তুমি?' জিগগেস করেছিলেন সেন সাহেব।

সমীরণ জবাব দিয়েছিল, 'না।'

—'সে কি হে, এই তোমাদের মওকা। যা কিছু বলবার এইবার বলে নেবে। অতবড় একজন ফেমাস রাইটার। আহা, কি বই 'চলন্তিকা!' ভাল না হলে নোবেল প্রাইজ পায়!' ভাবে গদ গদ অবস্থা সেন সাহেবের।

সমীরণের হাসি পায়। ইচ্ছে হয়, সেন সাহেবের মুখ থেকে 'চলন্তিকা'র দু' একটা কবিতা শোনার। কিন্তু লোভটা সংবরণ করে নিতে হয়।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ান সেন সাহেব। বলেন, 'না, যাই। তোমাকে ভেবেছিলাম বেশ চালাক। এবার দেখছি না, বাস্তব জ্ঞান বলতে কিছুই নেই তোমার। কেমন করে পাঁচজনের মধ্যে দাঁড়াতে হয় জান না।' সেন সাহেব ফিরে যান। মুখখানা দেখে খুশি মনে হয় না। যেন সন্তুষ্ট করতে পারেনি সমীরণ। বুঝি সমীরণের জন্য মায়া এবং করুণা এই মুহূর্তে এক সঙ্গে সমানভাবে বোধ করেন সেন সাহেব এবং কষ্ট পান।

যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ান। দরজার কাছে গিয়ে থেমে যান সেন সাহেব। বলেন, 'এক কাজ কর মাষ্টার। তোমাকে কিছু টাকা পাইয়ে দিচ্ছি। আমাদের অফিসে হয়তো পঁচিশ তারিখে কিছু একটা হবে। তোড়জোড় চলছে। চাঁদা তোলা হচ্ছে দেখেছি। প্রিসাইড হয়তো আমাকেই করতে হবে। সুতরাং রবি ঠাকুরের উপর একটা ভাল করে বক্তৃতা লিখে দাও দেখি। আমি সভায় সবাইকে শুনিয়ে গোটা পাঁচেক টাকা আদায় করে দিচ্ছি তোমাকে। টাকাটা আগাম পেয়ে যাবেখন। লেখাটা কালকেই নিয়ে এসো বুঝলে?' আর উত্তরের আশায় দাঁড়িয়ে থাকেন না সেন সাহেব! জীমকে নিয়ে ভেতরে চলে যান।

বসে বসে সমীরণ অনেক কথা ভেবেছিল। ভেবে কূল-কিনারা কিছু পায়নি।

দেয়াল ঘড়িতে দুটো বাজে। সময়ের গলায় যেন ঘণ্টা বেঁধে

দিয়েছে কে। টং টং করে শব্দ হয় দুটো। তারপর টিক-টিক, টিক-টিক। টিকটিকিটাকে দেখা যাচ্ছে না আর। পোকাটাও না। সমীরণ খোঁজে। পায় না। কোথাও নেই। টিকটিকিটা কিম্বা পোকাটা কেউ নেই।

বাইরে বৃষ্টি এখনো থামেনি। ঝড়ও না। চোখ দুটো এখন কড় কড় করছে সমীরণের। ঘুম আর আসছে না। আসবে না। বাকি রাতটুকু এমনি করেই শেষ হবে। ভোর হবে সেই পাঁচটায়। এখনো ঘণ্টা তিনেক বাকি। মা এখন কি করছেন? ঘুমোচ্ছেন হয়তো। বাইরে বৃষ্টি ঝড়ের রাত। ঘরের ভেতরে মেরুর শীতলতা। এ রাত্রে ঘুম আসবে ভাল। শোভনাও নিশ্চয়ই জেগে নেই। কিন্তু মায়ের কাছে একজন জেগে থাকা দরকার। সমীরণ থাকতো। ডাক্তার এসেছিলেন সকালবেলা। সাবধান করে দিয়ে গেছেন। মায়ের আশা খুব কম। এ যাত্রা বেঁচে ওঠা দুষ্কর। সমীরণের ভয় হয়। আতংক। দুশ্চিন্তায় মাথার ভেতরে ঝিম ঝিম করে। সমীরণ এদিক ওদিক তাকায় কান পাতে। না, টিকটিকিটা আর শব্দ করছে না আগের মত। কিছুটা আশান্বিত হয় সমীরণ। এবার আশ্বস্ত হয়।

আজ সকালেই মা বলেছিলেন, 'সেইদিন থেকে ইলা আর আসে না। বুদ্ধিমতি মেয়ে। আমার মনের কথাটা বুঝে নয়েছে। আমার ভারী কষ্ট হচ্ছে, খোকা। মেয়েটার জন্যে দুঃখ। হয়তো না জেনেই আঘাত করেছি ওকে।'

সমীরণ আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল। জিগ্‌গেস করেছিল, 'কি, কি জানতে পারনি মা?'

বিপদনাশিনী কিন্তু কথা বলেননি। চুপ করে পাশ ফিরে শুয়েছিলেন। অসীম ক্লান্তিতে চোখ বুজে পড়ে ছিলেন। সমীরণের কথার জবাব দেননি। অনেকক্ষণ পরে বেশ জড়িয়ে জড়িয়ে বলেছিলেন, 'ওকে একবার আসতে বলবি, খোকা। বড্ড দেখতে ইচ্ছে মেয়েটাকে।'

কথাটা আজ বলা যায়নি ইলাকে। ইলা আর আসেনি। শুধু আজ না। আজ কয়েকদিন ধরেই কাছে আসছে না ইলা। কিন্তু সমীরণ আসছে ঠিক। চাকরী যে।

পনের দিন দেখা নেই ইলার। ভেতর থেকে রোজই খবর পাঠিয়েছে কণিকা সেন। ইলা নেই মাসীর কাছে গেছে। বেড়াতে। মধুও বলতে পারেনি কোথায়। জিগগেস করলে আমতা আমতা করছে। এ কথা সে কথা বলে পালিয়ে গেছে কোথায়।

কিন্তু কালকেই দেখে ফেলেছে সমীরণ। বাইরে থেকে ভেতরে পালাচ্ছে ইলা। তবু পারছে না। চলতে কষ্ট হচ্ছে হয়তো ইলার। সমীরণের তাই মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, ইলা যেন আগের চেয়ে মুটিয়েছে। বেশ ভারী দেখাচ্ছিল ইলাকে। দেখে অবাক হয়েছিল সমীরণ। থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল রাস্তায়।

ইলা কিন্তু তারপরেও আসেনি। বাইরে বারান্দায় বেতের চেয়ার পেতে বসেছিল ইলা। সমীরণকে দেখে উঠে গেছে কোন কথা বলেনি। বড় শুকনো দেখাচ্ছিল ইলার মুখটা। কেমন রুগ্ন। কোন কথাই ইলা বলেনি আজ। আগের মত যেন খুশি হতে পারেনি সমীরণকে দেখে। বরং বিরক্ত মনে হচ্ছিল। হয়তো ভয়ও পেয়েছিল ইলা।

সমীরণ চমকে উঠেছিল। আজ আর মায়া হয়নি মেয়েটার জন্য। বরং ঘৃণায় বিষিয়ে উঠেছিল মনটা। ভয়ংকর কুৎসিৎ মনে হচ্ছিল ইলাকে। এবার বিপদনাশিনীর সন্দেহের মানে যেন বোঝে সমীরণ। মায়ের চোখে সেদিন ভয় দেখেছিল। যা দেখে বিপদনাশিনীকেই খারাপ লেগেছিল তার। কিন্তু না, মায়ের সন্দেহ আর ভয় এবার সত্যি হয়ে দেখা দিয়েছে। ইলার সর্বাঙ্গে সর্বনাশের দাগ। কিন্তু কেন এমন হয়। সমীরণ বোঝে না। বুঝি না বোঝার কষ্টেই চোখ ফেটে জল আসে সমীরণের। বুকের ভেতরে মুচড়ে ওঠে যন্ত্রণা। সমীরণ ভাবে, ইলাকে ভালবাসার কথা কোনদিন মনে হয়নি তার তবে এমন হয় কেন। ইলাকে ঘৃণা কিম্বা করুণা করার অধিকার আর কতটুকু বা আছে তার। অথচ

তার বুকের ভেতরেই যত কষ্ট। যেন ইলার জন্য যত যন্ত্রণা তার একার। ইলার জন্য মনে মনে এই দুঃখ করার অধিকারের কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় তাই নিজেকে অপরিচিত মনে হয় সমীরণকে। এত দুঃখ কোথায় ছিল এতকাল! মনের কোন গহনে ইলার জন্য এমন অলৌকিক আর্দ্রতা লুকিয়ে রেখেছিল সে! সমীরণ যেন চিনতে পারে না নিজেকে। এই মুহূর্তে মনের এমন অজ্ঞাতপূর্ব আচরণে সমীরণ অপরিসীম বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারে না।

তারপর অনেক্ষণ কেটে গেছে। রাত এখন দুটো বেজে পনেরো। ইলা আর আসেনি। কেউ না। সমীরণ চায়ও না কাউকে। এক শুধু সকাল হবার প্রতীক্ষা। ঝড় বৃষ্টি না থামুক, ভোর হলেই বেরিয়ে যাবে সমীরণ আর কোনদিন এখানে আসবে না।

দমকা বাতাসে মাঝে মাঝে শব্দ হচ্ছে বাইরে। এঘরে দরজা জানালায় অবশ্য সাড়া নেই তার। তবু খুট্ খুট্ শব্দ হচ্ছে কোথায়। এদিক ওদিক তাকায় সমীরণ। দক্ষিণ দেয়ালের বড় জানলাটা নজরে পড়ে। পাল্লার ছিটকিনিটা আঁটা হয়নি। বাতাসের বাড়ি খেয়ে পাল্লা দুটো কাঁপছে। শব্দ হচ্ছে খট খট। নৌকোর পালের মত পেট ফুলিয়ে কাঁপছে জানালার পরদাটা। জলের ছাট লেগে ভিজে একসা। সমীরণ এবার উঠে দাঁড়ায়। জানালাটা ভেজিয়ে দিতে এগিয়ে যায়। চারদিকে তাকিয়ে দেখে। না কেউ নেই। মানুষের সাড়া শব্দ নেই কোথাও। এ বাড়িটা মড়া। ঘরগুলি নিরীহ গোবেচারা। সমীরণের ইচ্ছে হল, ওপাশের সোফার উপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে। বসে বসে পা দুটোতে খিল লেগে গেছে। শিরদাঁড়া টন টন করছে। ইচ্ছে করলে সোফার উপরে শোয়া যায়। ঘুমোতে পারে। কিন্তু সাহস হয় না। জানালাটা বন্ধ করে আবার এসে চেয়ারেই বসতে হয়। সামনে শ্বেত পাথরের ছোট্ট গোল টেবিল। টেবিলের ওপরটা ঠাণ্ডা। টেবিলের

ওপর মাথাটা কাত করে রাখে। কন কন করে ওঠে গালটা। শরীরে কাঁটা দেয় শীত। ঘুম আসে না। চোখ মেলে তাকিয়েই থাকে সমীরণ।

ওপাশে দেয়ালের কোণ ঘেষে নক্সা কাটা কাপড়ের ঢাকা টিপয়। টিপয়ের উপরে চকচকে পেতলের ভাস। ভাসের ফুলগুলি বাসি। বাসি শুকনো আর বিবর্ণ ফুলের দিকে তাকিয়ে ইলাকে মনে পড়ে। ইলার ঘরটা বেশ সাজানো গোছানো। ইলা সেদিন টেনে নিয়ে গিয়েছিল ওর ঘরে। বাড়িতে কেউ ছিল না তখন। একলা ইলা। মধু ব্যস্ত ছিল নিজের কাজে। সেই প্রথম এবং সেই শেষ। এঘর ওঘর করে গোটা বাড়িটাই সেদিন সমীরণকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল ইলা।

ইলার ঘরটা বেশ। দেয়ালে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের ছবি। বইয়ের শেল্‌ফ জানালার কাছে ইলরে পড়ার টেবিল চেয়ার। দেয়ালে একরাশ মেঘ-মাথায় একটা পাহাড়ের ছবিওলা ক্যালেণ্ডার। ইংরাজী তারিখগুলি পর পর কালির আঁচড়ে কাটা। ফুলদানি। একরাশ ফুল। সব ফুলের নামও জানে·না সমীরণ। ওপাশে ছোট্ট খাট। নরম বিছানা। শিয়রের পাশে ছোট্ট টিপয়। টিপয়ে গ্লাস ভর্তি জল। সমীরণ জলটা খেয়ে নিয়েছিল। ইলা বলেছিল, দাঁড়ান'। বলেই চলে গিয়েছিল কোথায়। একলা ঘরে বসেছিল সমীরণ।

কয়েক মিনিট বাদেই সরবতের গ্লাস হাতে ইলা এসেছিল। হেসে বলেছিল, 'তেষ্টা পেয়েছে বলেননি কেন ? এটা খেয়ে ফেলুন।'

তারপর এঘর ওঘর করে সেই ঘরের দরজায়। সেদিন যে দরজা আগলে কণিকা সেন দাঁড়িয়েছিলেন। আজ ইলাও ইতস্তত করেছিল ভেতরে যেতে। ইলা বলেছিল, ,না, চলুন যাই।'

কিন্তু দরজা ঠেলে ভেতরে উঁকি মেরে দেখেছিল সমীরণ তার আগেই। কিন্তু কিছুই দেখেনি কোথাও। অবাক হয়েছিল ইলার ইতস্তত ভাব দেখে। সমীরণ তাকিয়ে দেখেছিল মুখটা আস্তে আস্তে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে ইলার। দরজাটা ভেজিয়ে সমীরণ বলেছিল, 'তাই চল। আর না।'

এই ঘরে এসে বসেছিল তারপর। সামনের চেয়ারটায় বসেছিল ইলা। সমীরণ এখানেই।

অনেকক্ষণ চুপ চাপ থেকে ইলা, বলেছিল 'ওঘরে আমিও যাই না সমীরদার। যেতে বারণ।' আজ আর ইলার চোখে আগুন ছিল না সেদিনের মত। কান্নায় ছলছলিয়ে উঠেছিল চোখ। অভিভূত হয়ে দেখছিল সমীরণ।

সমীরণ বলেছিল, 'মাঝে মাঝে আজকাল একটা কথা প্রায় ভাবি, ইলা।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে ইলার দিকে তাকিয়েছিল। কথা বলেনি ইলাও। মুখ তুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে দেখছিল। একটুকরো ক্লান্তির হাসি ফুটে উঠেছিল সমীরণের ঠোঁটের কোণায়। তারপর বলতে শুরু করেছিল ফের। 'আমি তোমাকে বুঝি না। সে দোষ কার? তোমার না আমার জানিনে।'

সমীরণের যেন কী হয়েছিল সেদিন। মাস্টারী করার বদলে ছাত্রীর মন বোঝার বাসনায় বেআব্রু হয়ে পড়েছিল। সেই চিরন্তন প্রেমের ন্যাকামির মতই। যাকে সমীরণ নিজেও বরদাস্ত করে না। ঘৃণা করে আর পাঁচজন সুস্থ মানুষের মত।

হয়তো মনে মনে খুশি হয় ইলা। এক পরম সুযোগ লাভের আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠে। অবাক হয়ে সেইদিনের কথাগুলিই ভাবে হয়তো। সমীরণ একদিন মধুর সঙ্গে নিজের মর্যাদার তারতম্যের একটা সোজা হিসেব দিয়েছিল ইলাকেই। এ বাড়ির মানুষের কাছে তাদের ছোট বড়র ভেদাভেদ তুচ্ছ। সেই সমীরণ আজ একান্তে বসে ইলার কাছে নিজেকে বিশিষ্ট এবং অন্যতম ভাবতে চাইছে। ইলার তাই এই প্রগলভতাটুকু ভাল লাগে। ইলা বলে, 'দোষ কারো না সমীরদা। দোষ আমাদের পরিবেশের। এখানে মনকে উদার এবং বড় করে তোলার মত স্বাস্থ্যকর হাওয়া বয় না। আমরা তাই এত ছোট আর সংকীর্ণ।'

মিনিট খানেক চুপ চাপ। কথা নেই কারো মুখে। দু'জনেই দুজনকে

দেখছে। নতুন করে চিনছে যেন। পড়া লেখা ফেলে এই হচ্ছে এখন। ঠোঁট মুচকে হাসে ইলা। শেষে আবার বলে, 'তোমার এই ভাবনার কারণ কিন্তু আমি বুঝি সমীরদা। সেদিন ঐ ঘরের দরজা আগলে দাঁড়িয়েছিল মা। আজ বাধা দিয়েছি আমি। কিন্তু কেন জান? তুমি, তুমি আর এখানে আসবে না, এই ভয়ে।'

সমীরণ অবাক হয়। 'ওঘরে ঢোকার সঙ্গে এ বাড়িতে না আসার সম্পর্ক ?

—'আছে সমীরদা, আছে।' ইলা যেন বয়স্কের মত সমীরণকে শান্ত করতে চায়। বলে, 'আমি জানি, ওঘরে গেলে ওঘরের বাসিন্দাদের ঘৃণা করতে শুরু করবে তুমি সেই সঙ্গে আমাকেও।'

—'একটু খোলসা করে বলতো ইলা' যেন অধৈর্য হয়ে ওঠে সমীরণ।

—ওঘরের দেয়ালে শুধু অশ্লীল ছবি। যা না দেখে ওঁরা ঘুমুতে পারে না।' আবার আগের মতই চোখ দুটো জ্বলে ইলার। হয়তো লজ্জা পায় ইলা। সমীরণ আর কিছুই বলে না। ইলা কখন উঠে যায় চেয়ে দেখে না সমীরণ। টের পায় না।

তারপর দিন থেকেই ইলার জ্বর। দিন সাতেক সময় লেগেছিল সেরে উঠতে। সাতদিনের আগে আর ইলাকে দেখেনি সমীরণ। কিন্তু অসুখ থেকে উঠে যেন কেমন হয়ে গেল ইলা। আগের মত হাসি নেই। মুখে কথা নেই ইলার। উদাসীন চোখ দুটিতে কিসের আতঙ্ক। ইলাকে দেখে সমীরণের ভয় হয়। দুঃখও।

বাইরে বৃষ্টি পড়া থেমে আসে। ঝড় নেই। শব্দ শোনা যাচ্ছে না আর। সমীরণ ঘড়ির দিকে তাকায়। আর এক ঘণ্টাও বাকি নেই ভোর হতে। এই সময়টুকুর প্রতীক্ষা। তারপর বেরিয়ে যাবে সমীরণ।

অসুখ থেকে উঠে ইলা যেন কেমন হয়ে গেছে। বড্ড খিটখিটে ওর মেজাজটা। মায়ের সঙ্গে বনে না।

ইলা সেদিন রাগ করেছিল। 'ভগবানদাসকে ভাল লাগে না আমার। ও কেন এখানে আসে ?'

কণিকা সেন রেগে গিয়েছিলেন, 'ছোট মুখে বড় কথা বলিসনে। ওকে তুই জানিস, কত বড় ধনী ভগবানদাস ?'

সেন ঘরে ঢুকেছিলেন সেই সময়। বলেছিলেন, 'কি বলছে ও ?'

ইলা আর দাঁড়ায়নি। ভেতর থেকে চলে এসেছিল এখানে। ভেতরের আর কোন কথাই শুনতে পায়নি সমীরণ। ইলার থমথমে মুখের দিকে তাকিয়েও জিগ্‌গেস করতে পারেনি কিছু।

সেন সাহেব এসেছিলেন একটু পরেই। বলেছিলেন, 'শুধু বইয়ের পড়া না, একটু কাট্‌সি শিখিও ওকে মাষ্টার।'

সমীরণ চুপ করে কথা শুনেছে সাহেবের। উত্তর দেয়নি কিছুই। সেন সাহেব আর দাঁড়ান নি। বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তখনই।

মিঃ উকিল বলেছিলেন সেদিন, 'আমাদের তুমি বোকা বানিয়ে দিলে সেন!'

সেন সাহেব কোন কথা বলেননি। কেবল ঠোঁট টিপে হাসছিলেন নিঃশব্দে।

'এত পড়াশুনা কবে করলে তুমি ?'

সেন হাসেন। বলেন, 'ওটা কিছুই হয়নি।'

উকিল বলেন, 'ভগবানদাস বললেন, ওদের ওখানেও তোমাকে প্রিসাইড করতে হবে।'

সেন সাহেব বলেন, 'ওদের ওখানে মানে ?'

'ওঁদের পাড়ায় একটা কুস্তির আখড়া আছে। ওঁদের ছেলে-ভাইপোরা ঐখানকার মেম্বার। আসছে সপ্তাহে ওরাও রবীন্দ্রজয়ন্তী করতে চায় ওখানে। মিসেস সেন আর তোমাকে যেতে হবে।'

সেন সাহেব হাসেন। বলেন, 'সে হবেখন।'

ভগবানদাসকে সমীরণ দেখেনি। কিন্তু নাম শুনেছে। এখানকার

সিনেমা হলের মালিক ভগবানদাস। দু'তিনটে কাঠের গোলা আর লণ্ডীর কারবারে মোটা পয়সার মালিক। বিয়ে করেছেন বাঙ্গালীর মেয়ে। তাই বাঙ্গালীর সঙ্গেই মিতালি করে সুখ পান। সেন সাহেবের সঙ্গে খাতির·করেন যেচে।

সমীরণ অন্য কথাই ভেবেছিল সেদিন। পাঁচটা টাকা সমীরণকে দিয়েছিলেন ঠিক। কিন্তু লেখাটা বেমালুম নিজের বলে চালিয়ে দেবার নির্লজ্জতা দেখে অবাক হয়েছিল সমীরণ। এবং সমীরণের কাছেই তাকে অস্বীকার করার অমন অবিচলিত ভাব দেখে সেনসাহেবের প্রতি সেইদিনই প্রথম ঘৃণায় মন শিউরে উঠেছিল। অসহায় রাগে এবং অপমানে মন তিক্ত হয়ে উঠেছিল সমীরণের।

আবার চমকে ওঠে সমীরণ। কান্নাটা এখন স্পষ্ট শোনা যায়। তার সঙ্গে হুমকি। সেন সাহেবের গলা। চাপা আওয়াজটা দেয়ালে ঘা খেয়ে গমগম করে। আর কান্নাটা মেয়েলি নয়। কণিকা সেন কাঁদছেন না। ইলাও নয়। তবে কে? কে কাঁদছে ভেতরে। ঠাহর করতে পারে না সমীরণ। বুঝতে পারে না। হয়তো মধু।

বাংলোর পেছনে রাস্তা। কোলাহলটা সরে যাচ্ছে সেদিকেই। দরজা ভেজানোর শব্দ হল। সমীরণের ইচ্ছে হল ছুটে যায়। কিন্তু পারে না। সাহস হয় না।

আবার সব স্তব্ধ। চুপচাপ। কয়েক মিনিটের ভেতরেই বাড়িটা আগের মত শান্ত হয়ে আসে। আবার নির্জন মনে হয়। নিজেকে একলা লাগে সমীরণের। ক্লান্ত লাগে। টেবিলের উপরে মাথা কাত করে সমীরণ ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোরবেলা। বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশের মুখখানা তবু গোমড়া। মেঘের উপরে মেঘ জমেছে আবার। বাতাস নেই। থমথম করছে চারদিকে।

আচমকা ধড়মড় করে উঠে বসে সমীরণ। সেন সাহেবকে দেখে কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়।

সেন সাহেব বলেন, 'আরে মাষ্টার যে! কখন এলে তুমি?'

সমীরণ গম্ভীর হয়ে বলে, 'আসিনি। এখানেই ছিলুন সারারাত।'

'অ্যা! বল কি! দেখেছো মধুটা কি ষ্টুপিড! সারারাত বসিয়ে রেখেছে বুঝি?' লজ্জিতের ভঙ্গিতে আপশোস করেন সেন সাহেব। তারপর উল্টে অনুযোগ করেন, 'তুমিই বা কি বলতো মাষ্টার। এটা কি তোমার নিজের বাড়িই ভাবা উচিৎ নয় এখন? কেন ইলাকে ডেকে পাঠালে না তুমি?'

সমীরণ এবার হাসে। মুখ নিচু করে নখ খুঁটতে থাকে হাতের। কথা বলে না।

সেন সাহেব যেন খুশি হন। বলেন, 'ইউ আর টু মাচ্ ক্লেভার মাষ্টার। পুরুষের মতই কাজ করেছো। কিন্তু বেলেংকারীটা না করলেই ভাল হত আগে। ওর জন্যে কিছু আটকাতো না। এসব ব্যাপারে আমি অত্যন্ত লিবারেল মাইণ্ডেড।'

সেন সাহেবকে এবার অস্পষ্ট লাগে। কথাগুলি কেমন ধোঁয়াটে আর রহস্যময়। সমীরণ বুঝতে পারে না। ভয়ংকর এক আশংকায় কেমন বিচলিত হয়ে পড়ে সমীরণ।

সেন সাহেব হাসেন। সমীরণের চোখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'মাষ্টার যেন আকাশ থেকে পড়লে! কিছুই বুঝতে পারছো না বুঝি?' সেন সাহেবের প্রশ্নে স্পষ্ট বিদ্রূপ।

সমীরণ ভয় পায়। বলে, 'সত্যি বুঝতে পারি না আপনার কথা।'

'আবার ন্যাকামি শুরু করলে তো মাষ্টার?' সেন সাহেব যেন জ্বলে ওঠেন। ভীষণ হিংস্র দেখায় চোখ দুটো। 'বলছি, ইলার কথা। আমি চাই, লোক জানাজানির আগেই বিয়েটা হয়ে যাক তোমাদের।'

কথা শুনে আঁতকে ওঠে সমীরণ। কাতর কণ্ঠে অনুনয় করে যেন,

'ভুল করছেন আপনি। আজ পর্যন্ত ইলার সঙ্গে তেমন কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি আমার।'

—'এটা ভদ্রলোকের বাড়ি মাস্টার। প্রসটিটিউশান নয়।' সেন সাহেব হুংকার দিয়ে ওঠেন।

সমীরণ কথা বলতে পারে না। ভয়ে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে সেন সাহেবের দিকে।

আর এই মুহূর্তে সেন সাহেব যেন মরিয়া হয়ে উঠেছেন। অতি হিংস্র এক আদিমতা জ্বলজ্বল করছে তাঁর চোখে। সেন সাহেব ডাকেন, 'মধু।'

মধু সামনে এসে দাঁড়ায়।

—'আমার চাবুক।'

আবার চলে যায় মধু। সেন সাহেব বলেন, 'এবার সব কথাই জলের মত বুঝে ফেলবে মাস্টার। ওর নাম ওষুধ। সব ভুল শুধরে যায়।'

ঠিক তখন। কোথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন কণিকা সেন। পাগলের মত ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েন সেন সাহেবের উপরে। 'নির্লজ্জ, বেহায়া কোথাকার। লজ্জা নেই তোমার?' ভয়ংকর উত্তেজিত মনে হয় কণিকাকে। কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে ওঠেন।

সেন সাহেব কিন্তু কেমন হয়ে যান মুহূর্তে। কেমন স্তিমিত। বলেন, 'তুমি যাও কণা।' সেন সাহেব পিছু হটে দেয়ালের দিকে সরে যান। যেন ভয় পেয়েছেন।

—'আমি যাবো? কোথায় যাবো আমি?' কণিকা সেন কেঁদে ফেলেন।

—'ভেতরে যাও।' সেন সাহেবকে মনে হয় আরো শান্ত।

এতক্ষণে সমীরণকে বুঝি চোখে পড়ে। কণিকা সেন পাগলের মতই চীৎকার করে ওঠেন। 'চেয়ে চেয়ে কী দেখছো মাস্টার, মজা?' রাগে এবং বিরক্তিতে ফেটে পড়েন যেন।

সমীরণ কথা বলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কী করবে ভেবে পায় না।

মধু ফিরে আসে। হাতে সত্যি সত্যি চাবুক ওর। সেন সাহেব বলেন, 'দে চাবুক।'

কণিকা সেন এবার মধুর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন যেন। ঠেলতে থাকেন বাইরে। বলেন, 'সঙের মত দাঁড়িয়ে থেকো না মাষ্টার। বেরিয়ে যাও। এখানে আর কোনদিন এসো না।'

সমীরণ বেরিয়ে যায়। চাবুক হাতে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সেন সাহেব। মধু চলে যায় ভেতরে। সেন সাহেব এবার কণিকার দিকেই এগিয়ে আসেন। বুঝি ভয় নেই কণিকার। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েই থাকেন।

সমীরণ পথে নামতেই ঝম-ঝম করে বৃষ্টি শুরু হল ফের। সেন সাহেবের হাতের চাবুকের মতই এক তীক্ষ্ণ কষাঘাতে আকাশটা চৌচির হয়ে গেল। আর্তনাদ করে উঠল আকাশটা।

বাইরের দরজাটা খোলা। হয়তো সারা রাত খোলা ছিল এমনি। এবং শোভনাই খুলে রেখেছিল দরজাটা। যা বৃষ্টি। বৃষ্টিতে ভিজে কে খুলে দেবে দরজা। অত গরজ কার। তা ছাড়া বাড়ির ভেতর থেকে কে শুনবে সমীরণের ডাক। ডেকে মরে গেলেও যে টের পাবে না কেউ। বুদ্ধি করে শোভনা হয়তো দরজাটা খুলে রেখেছে তাই। কিন্তু যদি চোর ঢুকতো বাড়িতে। শোভনার যেমন আক্কেল। মনে মনে গজ গজ করতে করতে সমীরণ বাড়ির ভেতরে যায়।

বিপদনাশিনীর ঘরের দোর খোলা। ঘরের ভেতরে মানুষের ভিড়। সমীরণ হতভম্বের মত বাইরে দাঁড়িয়ে কি ভাবে। অজানা সংশয়ে বুকটা কাঁপে। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতই দোলে মনটা। এই মুহূর্তে মায়ের কাছে যেতে যেন ভয় হয়। সকলেই সমীরণের দিকে তাকিয়ে। সমীরণ কিন্তু তাকাতে পারছে না কারো দিকেই। কথা কেউ বলছে না। কেমন নিথর, নীরব হয়ে গেছে সব। সমীরণকে দেখে বোবা হয়ে গেছে। মনে মনে অসম্ভব বিচলিত হয়ে পড়েছে সবাই।

সর্বাঙ্গ কাঁথা দিয়ে ঢাকা। নিশ্চল, নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে আছেন

বিপদনাশিনী। বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টি মেলে একবার সকলের মুখের দিকে তাকায় সমীরণ। জিগেগেস করতে পারে না কিছু ভয়ে। যেন গলার কাছে এসে কথা আটকে গেছে। মনে বুঝি আশা আছে এখনো। সকলের চোখেই এক কথা। ভয়ংকর এক করুণা। সহানুভূতি যেন।

মাথায় ঘোমটা টেনে, হাঁটুর উপর থুতনি রেখে মায়ের পাশে পাথর হয়ে বসে আছে শোভনা। আস্তে আস্তে মায়ের শিয়রের কাছে এগিয়ে যায় সমীরণ। বৃষ্টিতে কাপড় জামা ভিজে জব জবে। টুপ টাপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে গা থেকে। ভিজে যাচ্ছে বিছানা মায়ের তবু সাড়া নেই। নড়ে চড়ে উঠছে না আগের মত। কারো মুখেই কথা নেই তবু। স্তব্ধ হয়ে একটা ভয়ংকর মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছে সবাই। উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হয়ে উঠছে যেন। একে একে দীর্ঘশ্বাসে ভরে উঠছে ঘরটা। কিন্তু সমীরণ না। সবাইকে অবাক করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে শোভনা। বিপদনাশিনীর কেউ না যে। সমীরণ পাথর হয়ে বসেই থাকে। নির্ঘুম চোখ দুটো আর জ্বালা করছে না। ভিজে কাপড়ে শীত না। কেবল অসহ্য মনে হচ্ছে এ ঘরের আবদ্ধ বাতাসে পলেস্তরা খসা দেয়ালের আর স্যাঁতসেতে মেঝের ভ্যাপসানির সঙ্গে পোড়া কেরোসিনের গন্ধটা। হয়তো দরজা জানালা বন্ধ ঘরে সারারাত লণ্ঠনটা জ্বলে জ্বলে সব তেল ফুরিয়ে এইমাত্র নিভেছে। এ ঘরে মানুষ টিকতে পারে না। সমীরণ নিঃশব্দে বাইরে যায়।

শোভনার স্বামী বিপিন বুকে জড়িয়ে ধরে সমীরণকে। ভিজে গলায় বলে, 'ছিঃ সমীর। তুমি না বড় হয়েছো। এ সময়ে মাথা ঠিক রাখতে হয়। তোমার কি অবুঝ হলে চলে। এখন অনেক কাজ তোমার।'

সমীরণ কাঁদে না। বলে না কিছু। হাসে। বিপিনের হাতটা ছাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে না। কিন্তু ভয়ে ভয়ে সবাই দেখে সমীরণকে, বিপিনও।

দুপুরেও মেঘ ছিল। বৃষ্টি হয়েছে কয়েক পশলা। বিকেলে মেঘ উধাও। আকাশ ফরসা। শেষ বেলায় রোদ দেখা দিয়েছিল। বৃষ্টি

ধোয়া গাছ গাছালির পাতায় পাতায় ঝিক মিক করছিল আলো। বড় একটা রামধনু উঠেছিল আকাশে। তারপর অন্ধকার হয়ে এল চারদিক। রাত্রি নামল। অন্ধকার আকাশে ফুটে উঠল যুঁথির মত অসংখ্য তারা।

অন্ধকার ঘর। এক কোণে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দু'হাঁটুর ভেতরে মুখ গুঁজে বসেছিল সমীরণ। ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে এল শোভনা। হাতে প্রদীপ আর ধুনুচি। কুলুঙ্গিতে বিপদনাশিনীর লক্ষ্মীর পট। পরিষ্কার কাপড় পরেও ছোঁয়ার হুকুম নেই কারো। আজ নির্ভয়ে সেখানে ধূপ-ধুনো দিয়ে, প্রদীপ রাখে শোভনা। কেউ বারণ করে না। ক্ষীণ আপত্তি না পর্যন্ত। পটের সামনে ছোট্ট পেতলের ঘটে শুকনো আমের পল্লব। ঘটের উপরে ফুলগুলি বিবর্ণ। কালচে রং ধরেছে আমের পাতায়। কয়েকটা পল্লব থেকে খসে পড়েছে নিচে। ঘটের পাশেই লক্ষ্মীর পাঁচালি আর বাংলা গীতা। বিপদনাশিনী রোজ পূজো আহ্নিক সেরে অন্তত একটি অধ্যায় বিড় বিড় করে পড়তেন। তারপর মাথায় ঠেকিয়ে রেখে দিতেন ওখানেই। পাঁচালিটা সপ্তাহে একদিন। বৃহস্পতি-বারে একটু ঘটা করেই পূজো হত লক্ষ্মীর। পূর্ণিমাতে উপোস থাকতেন বিপদনাশিনী। লক্ষ্মীর পটের পাশেই রামশংকরের খড়ম। সকালে বিকালে যার উপরে অনেকক্ষণ মাথা রেখে চুপ করে থাকতেন বিপদনাশিনী। কুলুঙ্গির ভেতরটা যত্নহীন। বিবর্ণ। বাইরেটা খানিক খালি খালি। কেমন শূন্য।

খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে শোভনা তারপর টেবিলের কাছে এগিয়ে যায়। হ্যারিকেনটা জ্বালে। তবু মুখ তোলে না সমীরণ। হাঁটুতে মাথা গুঁজে তেমনি বসে থাকে চুপ চাপ। সজল চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকে শোভনা। নির্বাক। ওঘরে ছেলেটা কাঁদে। শোভনার ছেলে। বিপিন ঘরে নেই। ছেলেটা একলা। শোভনা বেরিয়ে যায় আস্তে আস্তে। সন্তর্পণে ভেজিয়ে দেয় দরজাটা। শব্দ নেই।

সমীরণ মুখ তোলে এইবার। বিষণ্ণ, বোবা চোখে চারদিকে তাকিয়ে দেখে। যেন চেনা যায় না। এ যেন সমীরণের অচেনা, অজানা এক ঘর।

যে ঘর সমীরণ কোনদিন দেখেনি। কোনদিন আসেনি যেখানে। তক্তপোষটা খালি। ছেঁড়া কাঁথা আর ঝুলে ঝুলে তোষকের উপর তেলচিটে বালিশের বিছানাটা আজ আর নেই। কেউ নেই ওখানে। কারো সাড়া শব্দ নেই। এখন সন্ধ্যে বেলা। কুলুঙ্গির ধারটাও আজ ফাঁকা। দরজা ঠেলে ভেতরে আসছে না কেউ। আজ সব শূন্য। সমীরণের জীবনটা অবধি বিস্বাদ। এমনি এক বর্ণহীন শূন্যতা ওকে ঘিরে রেখেছে আজ। সমীরণ যেন অসহায় বোধ করে নিজেকে। কেমন একলা।

শোভনা আবার আসে। এক ফাঁকে দুখানা কম্বল দিয়ে যায়। দুটি আম আর এক গ্লাস দুধ এনে বলে, 'কিছু পেটে না দিলে পিত্তি পড়ে অসুখ হবে। এটুকু খেও সমীরবাবু।'

দুধ এবং আমের দিকে তাকিয়ে বুঝি এই মুহূর্তে বিপদনাশিনীর কথা ভুলে যায় সমীরণ। মনে পড়ে, কাল বিকেল থেকে কিছু খায়নি সে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কথা ভুলে হয়তো একমাত্র শোভনার প্রতি মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে এখন। বড় ক্লান্ত লাগে। সমস্ত শরীর এখন অবশ হয়ে আসে। সমীরণ ভাবে, এক রাত সে ঘুমায়নি।

গভীর রাত্রে বিছানা বালিশ বগল-দাবা করে বিপিন আসে এ ঘরে।

বলে, 'এ কদিন রাত্রে আমিই তোমার কাছে থাকবো সমীর।'

সমীরণ বলে, 'না, আপনি যান। আমার ভয় করবে না বিপিনদা।'

বিপিন মাথা নাড়ে। বলে, 'না না, তাই কি হয়। এখন এমন থাকতে নেই।'

সমীরণ প্রতিবাদ করে না আর। শক্তি নেই। চুপ চাপ কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে। ঘুমোয়।

শোকের আয়ু সীমিত। কিন্তু সমীরণের মধ্যে সেই সীমাবদ্ধ শোকেরও কোন প্রকাশ নেই। অবাক হয়েছিল সবাই। কেবল শোভনা আর বিপিন মনে মনে প্রমাদ গণে। ইদানীং কথা বলা ছেড়ে দিয়েছে সমীরণ। আজকাল একলা চুপ চাপ থাকতেই যেন ভাল লাগে ওর।

দিন পনের পরে।

সারাদিন ঘরে ছিল না সমীরণ। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়িয়েছে। বিকেলের দিকে ঘরে ফেরে। সমীরণ তখন বেশ ক্লান্ত। মুখখানা শুকনো। গায়ের জামাটা ঘামে ভিজে একসা। ঘরে ঢুকে সমীরণ টুক টুক করে তক্তপোষের তলায়, কুলুঙ্গির ভেতরে বিপদনাশিনীর হাতে সাজানো গোছানো টিনের কৌটো, কাচের বয়ামের ভেতরে কি খোঁজে। পায় না। সমীরণ যেন বিরক্ত হয়ে উঠে। রান্না শেষেঘরে যায়। কয়লা ভেঙ্গে উনোনে আঁচ তুলে দিয়ে গঙ্গায় যায়। মিনিট পনেরো সময় লাগে। স্নান সেরে রান্না ঘরে ঢুকে এবার মাথার ভেতরে আগুণ জ্বলে উঠে। ভারী রাগ হয় নিরীহ গোবেচারা উনোনটার উপরেই। আগুণের ছিটে ফোঁটাও নেই। উনোনটা ধরেনি। ক্ষিদে পেয়েছে বেশ। সারাদিনে খাওয়া হয়নি কিছুই। এখন পেটের নাড়ী জ্বলছে। সমীরণের এবার কান্না পায়। আবার উনোন ধরাতে বসে।

পেছনে পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকায় সমীরণ। একটু আশ্চর্য হয়ে দেখে শোভনাকে। দরজার চৌকাট ধরে দাঁড়িয়েছে শোভনা। কথা বলছে না। মুখখানা থম থম করছে রাগে। বুঝি অভিমানেই ছল ছলিয়ে উঠেছে চোখদুটো। সমীরণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

শোভনা কথা বলে, 'আমাকে বোধ হয় একটা মানুষ বলে মনে হয় না তোমার, না সমীরবাবু।'

সমীরণ বলে, 'শোভনাদি, আমি তো কিছুই করিনি। রাগ করছো কেন?'

'রাগ!' মুচকে হাসে শোভনা। বলে, 'না, রাগ করবো কার উপর। সংসারে তোমার আর কে-ই বা আছে।'

শোভনার চোখ দুটো এবার সত্যি জলে ভরে যায়।

সমীরণ বলে, 'না জেনে আমি কি অপরাধ করেছি কিছু?'

শোভনা বলে, 'ছি অপরাধ করবে কেন তুমি। আমিই ভুল করে রান্না করেছিলাম তোমার জন্যে। কিন্তু আজকে জানিয়ে দিলে তো, কাল থেকে আর অযথা কষ্ট পাবো না তোমার কথা ভেবে।' ভুলেই গিয়েছিলাম, আমরা তোমার কেউ না।'

সমীরণ এবার হেসে উঠে দাঁড়ায়। কাছে এসে বলে, 'শোভনাদি একটুতেই এমন রাগ তোমার। আরো মস্ত মস্ত অপরাধ যখন করবো, তখন কী করবে? আমার খিদে পেয়েছে। খেতে দেবে বল।' আদুরে ছেলের মত জীবনে এই প্রথম শোভনার হাত ধরে সমীরণ। শোভনা কিন্তু সমীরণের এই অভাবিত আচরণে আশ্চর্য হয় না আদৌ।

দিন কয়েক পরে। অনেক রাত করে ঘরে ফেরে বিপিন। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে আরো রাত হয়। বৃষ্টি নামে তারপর ছাতা মাথায় পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে পাশাপাশি পথ চলে সমীর আর শোভনা। জীর্ণ বাড়ীর পুরনো উঠান। শ্যাওলা পড়ে পড়ে কালচে রং ধরেছে সারা উঠোনটায়। শান-বাঁধানো উঠোন। পুরনো কৌলিন্য আর নেই। কয়েক ফোঁটা জল পেলেই সাংঘাতিক পিছল হয়ে যায়। একটু অসাবধান হলেই পা পিছলে কুপোকাত।

ছাতাটা বাইরে রেখে অন্ধকার ঘরে ঢোকে দুজন। বৃষ্টির ছাঁট লেগে দু'জনেরই শরীরের অর্ধেক ভিজে গেছে। গা বেয়ে জল পড়ছে টুপ-টাপ। শীত-শীত বোধ হচ্ছে শোভনার। কাঁপন ধরেছে সমীরণের দেহেও। শোভনাই বালিশের তলা থেকে দেশলাই খুঁজে বের করে। আলো জ্বালে এঘর-ওঘর দু'ঘরেরই কর্ত্রী যে এখন শোভনা। দেয়ালের গায়ে কাঠের আলনা। সমীরণকে শুকনো কাপড় জামা পেড়ে দেয় শোভনা। যাবার সময় কাছে আসে। নিপুণ রহস্যময়ীর মতই সামনে দাঁড়ায় সমীরণের। একগাল হাসি হেসে বলে, 'শোও গো দেবর। ঘুমোও। এ জন্মে আর হল না। আবার সামনের জন্মে দেখা যাবে। তখন না হয় বাসর জাগা যাবে সারারাত। এখন আর হয় না। কলংক আর সয় না এ বয়সে।' মুখে রাতের কালো আর আলোর আলো মেখে সমীরণকে অপরিসীম লজ্জার সমুদ্রে ডুবিয়ে শোভনা এগিয়ে যায়। মাথায় ছাতা মেলে অন্ধকার উঠোনে হারিয়ে যায়।

শুয়ে শুয়ে ঘুম আসে না চোখে। বাইরে বৃষ্টি। চপল বাতাসে সর্-সর্, ঝর্-ঝর্ শব্দ। কেমন মাদকতা যেন। শোভনার কথা ভাবে

সমীরণ। বিপিনের কথা। ভেবে অবাক হয়। ভাল লাগে ওদের।

মাকে মনে পড়ে। এমন রাত্রে বিপদনাশিনীও ঘুমোতেন না। ঘুম আসতো না তাঁর চোখে। মায়ের পাশে শুয়ে সমীরণ গল্প শুনত তখন। এই এত বড় হয়েও। ভাল লাগত সেই গল্প। বিপদ-নাশিনীর জীবনের আদ্যোপান্ত ইতিহাস। দুঃখের কথামালা। শুনতে ভাল লাগত। ব্যথায় ভরে উঠত মন। সমীরণের মনে কত যে কথার উদয় হত তখন। কত আশা কত স্বপ্ন। বিপদনাশিনীর চিরস্থায়ী দুঃখটাকে একদিন তাড়িয়ে দেবে সমীরণ। ব্যথাটাকে সারিয়ে তুলবে। কিন্তু তা আর হল কই! এই মুহূর্তে আবার শূন্য মনে হয় নিজেকে। কেমন নির্জন। এক দুর্বোধ বিষাদে মনটা অসাড় হয়ে থাকে সমীরণের।

শোভনার ঘরে শব্দ হল কিসের। ঠিক সেদিনের মত। সেন সাহেবের বাংলোর মতই শব্দটা। সেই রাত্রির পরে আজকে এই প্রথম বৃষ্টি। ভয়ে-ভয়ে আবার সেই পিছে ফেলে আসা দিনগুলি মনে পড়ে। ইলার কথা ভেবে দুঃখ হয়। কী হল ইলার! কেন অমন হল!

সেন সাহেবকে আজো হিংস্র মনে হয়। কিন্তু কণিকা সেনকে বোঝা যায় না। সমীরণের কাছে আজো দুর্বোধ্য কণিকা সেন। ভাল-মন্দ কিছুই ভাবা যায় না তাকে। কণিকা সেন আজো অস্পষ্ট। কিন্তু বিজয়। দেখলে মায়া হয় ছেলেটাকে। দেহ নেই। দৃষ্টি নেই। সকলের কৃপার পাত্র বিজয়। আর কেমন ভীতু। মধুটা মনমরা। আজ্ঞাবহ দাসমাত্র। সকলের হুকুম তামিলের একটা বিশ্বাসী যন্ত্র। পিকীনিজটাকেও মনে পড়ে। মধুর চেয়েও দামী সেন সাহেবের সেই আদুরে কুকুরটাকে। সমীরণ কাউকে ভোলেনি। ইলাকে মনে পড়ে সবচেয়ে বেশী। ইলার বুকের ব্যথাটার হদিশ সে আজো পায়নি। তারপর একসময় বৃষ্টি থামে। চোখ জড়িয়ে আসে ঘুমে। সমীরণ ঘুমিয়ে পড়ে।

বিপিন চাকরী করে ইঁটখোলায়। সারাদিনে নাওয়া-খাওয়ার সময়টুকু ছাড়া ঘরে আর থাকে না। অনেক রাত্রে ঘরে ফেরে। ঘরের খোঁজ-খবরের ধার ধারে না বড়।

সকাল বেলা সমীরণের ঘরে চা-জলখাবার হাতে শোভনা আসে। সমীরণ তখন কাপড় জামা পরে তৈরী হচ্ছে। টেবিলের উপর চায়ের পেয়ালাটা ঠক করে রাখে শোভনা। সমীরণ ফিরে তাকায়। শোভনা জিগ্‌গেস করে, 'কোথায় যাওয়া হবে বাবুর?'

সমীরণ হেসে জবাব দেয়, 'চাকরীর উমেদারীতে।'

—ফিরবেন সেই সূয্যি কাত করে তো? থাক, লবণ-মোহরের চাকরী আর জলে ভেসে যাচ্ছে না।' কপট ক্রোধে শোভনা সমীরণের দিকে তাকায়। বলে, 'তার আগে দাসীকে উদ্ধার করে যান আপনারা। রামকে বেঁধেছি, এখন লক্ষ্মণ ভাইটি থাকলেই বাঁচোয়া। কোথাও বেরুবেন না দয়া করে।' হেসে বেরিয়ে যায় শোভনা।

বিপিন আসে একটু পরেই। হাতে বাজারের থলে। দরজায় দাঁড়িয়ে সমীরণকে ডাকে। বলে, 'দেখলে তো কাণ্ডখানা। এই সাত-সকালেই আমাদের নাইয়ে-খাইয়ে উনি মুক্ত হতে চান। ওদিকে আমার যে কি ক্ষতি হচ্ছে বুঝবে না নবাবজাদী। আরে বাপু তোমার আঁচল ধরে বসে থাকলেই হবে। খাওয়া জুটবে কোত্থেকে। আজ না হয় খাইয়ে মুক্ত হতে চাইছো। দু'দিন পরে চাকরী যদি না থাকে, তখন? সে কথা যদি কানে ঢোকে ওর। বললে বলবে, চাকরী যেন কেউ করে না আর। ঐ যে বলে না, স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ংকরী?

সমীরণ বিপিনের কথা শুনে হাসে।

বিপিন এবার রাগে। আশ্চর্য হয়ে বলে, 'আরে হাসছো যে তুমি! তুমিও দেখছি লোক সুবিধের নও। ভয়ংকর ছেলে তুমি সমীরণ।' মুখেচোখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তোলে বিপিন।

সমীরণ এগিয়ে আসে। বিপিনের হাত থেকে থলেটা নিয়ে বলে, দিন, বাজারটা আমি করি আজ। আপনি না হয় থাকুন কিছুক্ষণ।'

বিপিন বলে, 'বেশ ছেলে বাবা। বাজার করার ফিকিরে কিছুক্ষণ বাইরে ঘুরে আসার মতলব না? আর আমি একলা ঘরে বসে মেয়ে মানুষের খোঁটা শুনি!'

আড়াল থেকে ঝংকার দিয়ে ওঠে শোভনা। 'আজ আর বুঝি খেতে হবে না।

বিপিন জিব কেটে বলে, 'যাও হে, যাও। এদিকে এলে আর রক্ষে থাকবে না।'

সমীরণ হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়।

খুশি আর ধরে না মুখে। বাজার দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে শোভনা। আনাজগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে বলে, 'শাপে বর হল আমার। তোমার হাতে তবু পয়সা ফিরেছে। আর উনি!' আড় চোখে বিপিনের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট ওল্টায় শোভনা। বলে, 'উনি হলে আরো পয়সা লাগতো। অথচ এত জিনিসও আসতো না। শুধু কথায় আছেন। কাজে নেই।'

বিপিন বুঝি ক্ষুণ্ণ হয়। বলে, 'এত তরি-তরকারি এসেছে। তার উপরে মাছ। খোঁজ নিয়ে দেখো, কাকে পয়সা না দিয়েই চলে এসেছেন তোমাব লক্ষ্মণ দেবর।'

শোভনা যেন রাগ করে। 'হ্যাঁ, তুমি কিনা। হকের পাওনা নিয়েও ফাউ চাইবে আবার।' শোভনা সমীরণের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বুঝলে সমীরবাবু, ওর সঙ্গে কিছু কেনা-কাটা করতে যাওয়া এক ঝকমারি।

বিপিন এবার চটে লাল। বলে, 'কবে কোথায়, কি কিনতে গিয়ে বিপদে পড়েছো আমার সঙ্গে তা বলতে হবে এখন।'

—'তবে বলবো? বলবো সেই কাপড় কেনার কথা?' বাঁকা চোখে স্বামীর দিকে তাকায় শোভনা। বিপিন যেন মুহূর্তে বদলে যায়। মিইয়ে যায় যেন। বলে, 'ওটা তো দোকানদারের সঙ্গে ঠাট্টা। হরি আমার বন্ধু যে। নইলে কুড়ি টাকার শাড়ি কেউ —'

শোভনা বলে, 'থাক, থাক। আপনার দৌড় দেখা গেছে মশাই।'

বিপিন সমীরণকে সাক্ষী মানে এবার। বলে, 'দেখছো ভায়া কি চালাক এই মেয়েটা। কোন কথাই বলতে দেবে না আমাকে।'

সমীরণ হাসছিল। উপভোগ করছিল এদের নির্বিরোধ কলহটুকু। এইবার বিপিনের অসহায়তা লক্ষ্য করে বলে, 'সকাল থেকেই আপনারা দেখছি দু'জনে দুজনের পেছনে লেগেছেন। ব্যাপার কি ?'

বিপিন বলে, 'জিগ্‌গেস কর ওকেই।'

শোভনা সস্তা রসিকতার সুরে বলে, 'একটা বিয়ে করলেই বুঝতে পারবে সমীরবাবু, বউ কেন জ্বালায়।' সমীরণের দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে ফেলে শোভনা।

বিপিন সাবধান করে। চেঁচিয়ে বলে, 'বিওয়্যার অব দা উইমেন, ভায়া। ঈশ্বরের সবচেয়ে সাংঘাতিক সৃষ্টি মেয়েমানুষ। বিয়ে কখনো করবে না। ও হচ্ছে দিল্লীকা লাড্‌ডু।'

শোভনা টিপ্পনি কাটে। বলে, 'ইস্, দেখা যাবে কে কত বড় ভীষ্মদেব

পরদিন ভোরবেলা। ঘুম থেকে উঠেই বিপিন হাঁক দেয়, 'কই গো ভাল মানুষের মেয়ে। বাজারের থলেটা দাও দেখি।'

শোভনা ভুরু কুঁচকে বিপিনের মুখের দিকে তাকায়। বলে, 'ব্যাপার কি, আজ এত তপ্ত-গরজ কেন বাজারের ? বিড়ির পয়সা নেই বুঝি ?'

সমীরণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে। বিপিন রেগে যায়। বলে, 'আমি চোর নাকি ?'

শোভনা হেসে জবাব দেয়, 'না গো মশাই, তুমি ধর্মপুত্তুর যুধিষ্টির।'

বিপিন বলে, 'হাঁ, যুধিষ্টিরই তো। আজ একবার পরীক্ষা হয়ে যেতো, তোমার লক্ষ্মণ দেবরের চেয়ে বাজার করতে আমিও অপটু নই।'

শোভনা হাত জোড় করে বলে, 'সে তো আজ সাত বচ্ছর ধরেই দেখছি। আজ না হয় ক্ষেমা দিন।'

বিপিন বলে, 'দিলাম। কিন্তু মনে রেখো আমি সমীর না। ওদের মত ভুলো মন না আমার।

শোভনা বলে, 'বাহাদুরী থাক।'

—'বাহাদুরী নয়। তুমি তো জান না, ওরা হচ্ছে কবি মানুষ। মতিগতিই ওদের আলাদা। বাজারে যেতে যেতে দুটি পাকা বেল, পাকা তেল হয়ে যায়।'

শোভনা বলে, 'তবু তোমার হাতে আর পয়সা দিচ্ছিনা বাজারের।'

বিপিন বুঝি আহত হয়ে চলে যায়। রীতিমত অপমানিত বোধ করে নিজেকে।

একসময় সমীরণের কাছে চুপি চুপি বলে, 'আনা চারেক পয়সা চেয়ে দাও না সমীর বাবু। একটাও বিড়ি নেই পকেটে। সেই সকাল থেকে ধোঁয়া না গিলে পেট ফুলে উঠেছে এখন।'

বিপিনের করুণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে সমীরণ হো-হো করে হেসে ওঠে।

এ আরেক পরিবেশ। এখানে নিজেকে মুক্ত ভাবা যায়। শোভনা আর বিপিনের সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে সমীরণের এক ঘেয়ে পুরোনো দিন-রাত্রিগুলি কোথায় হারিয়ে যায়। এখন বুঝি বাইরে আর মন টেকে না। শোভনার সামান্য অনুরোধেই সারা দুপুরটা ঘরে বসে কাটিয়ে দেয় সমীরণ।

শোভনা বলে, 'টুইশানিতেও যাবে না, নাকি?'

সমীরণ হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারে না। বোকার মত শোভনার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর হেসে বলে, 'টুইশানিটা ছেড়ে দিলাম শোভনাদি।'

—'ভালই করেছো। না ছাড়লে, আমিই তোমাকে সে-কথা বলবো ভেবেছিলাম।' শোভনা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে।

—'কিন্তু কিছু একটা করতে হবে তো।' শোভনার চোখে চোখ রাখে সমীরণ।

পা ছড়িয়ে বসে ছেঁড়া ব্লাউজটা সেলাই করছিল শোভনা। সমীরণের কথা শুনে সেও তাকায়। সূচে গাঁথা সুতোটা দাঁতে কেটে জবাব দেয়

শেষে। 'যতক্ষণ সেই কিছু একটা না হচ্ছে ততক্ষণ কী আর করবে বলতো!'

সমীরণ মাথা নাড়ে। বলে, 'তাই বলে এমনিভাবে তো চলা যায় না বেশীদিন।'

—'দেখ সমীরবাবু, তোমার মনটা ভয়ানক ছোট।' শোভনার বুঝি রাগ হয়।

সমীরণ ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর হেসে আস্তে আস্তে বলে, 'রাগ করছো কেন শোভনাদি। আমি তোমার মত অবুঝ নই।'

—'কিসে অবুঝ দেখলে শুনি?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে শোভনা।

—'কিসের আবার। তোমার সংসারের ব্যাপারেই তুমি অবুঝ। যাকে বলে বেহিসেবী।' সমীরণ হাসে।

শোভনা বুঝি ক্ষুণ্ণ হয়। বলে, 'এত বড় কথা তুমি আজ আমাকে বলতে পারলে সমীরবাবু? আমি বেহিসেবী! তোমার দাদাও অমন কথা বলতে সাহস পায় না।'

সমীরণ বলে, 'কেমন করে সাহস পাবেন বল? বিপিনদা থাকেন তোমার সংসারের পেছনে। আর সেখানেই তোমার নজর কড়া। একটা পিঁপড়েরও বিনা হুকুমে যাবার উপায় নেই। আর সামনে তোমার পাহারা নেই। তাই বড় বড় হাতীও সেখানে পাচার হতে দ্বিধা করে না। এই কি তোমার হিসাব?'

শোভনা বলল, 'কেন একথা বললে, জানি। আচ্ছা সমীরবাবু, যতদিন একটা কিছু না হচ্ছে তোমার, হাতীর খরচ ততদিন বাকীতেই চলুক। সুদিন যখন আসবে কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দিও। আমি তখন যেচে পাওনা বুঝে নেবো কথা দিচ্ছি। কিন্তু যতই সুপারিশ কর না কেন, ঐ পিপঁড়েটির জন্যে একটি পয়সাও ব্যয় করতে পারবো না আমার সংসার খরচের টাকা থেকে। কারণ বিড়ি না খেলে কেউ মরে না। ভাত না খেলেই মরে।' শোভনা উঠে দাঁড়ায়। এক নজর সমীরণকে দেখে।

তারপর ব্লাউজ আর সূচ-সুতো হাতে বেরিয়ে যায়। হতভম্বের মত একলা ঘরে বসে থাকে সমীরণ।

'কথাটা সমীরণ কদিন থেকেই ভাবছে। পুরো একশ'টি টাকাও বিপিন পায় না। অথচ ছেলেকে নিয়ে তিনজন খাইয়ে। সমীরণ সেখানে বোঝার উপর শাকের আঁটি। লজ্জা সমীরণের সে জন্যেই। তবু উপায় নেই। এ যেন আরেক অস্বস্তি।

বিপিন নির্বিকার। সংসারের সমস্ত জটিলতাকে এড়িয়ে চলার এক অলৌকিক শক্তি যেন অর্জন করেছে সে। বিপিন তাই সর্বক্ষণের জন্যে উদাসীন। একা শোভনাকেই সব ধকল সইতে হয়। অথচ অভাব অনটনের কাঁদুনি গেয়ে সমীরণকে সে একবারও বিচলিত করে না।

পাঁচ মিনিটে খেয়ে ওঠে বিপিন। শোভনা সমীরণকে বলে, 'ওর মত তোমার তো মাঠে ধান পাকেনি সমীরবাবু। বর্গীরা লুটে নেবার ভয় নেই। তুমি খাও।' সমীরণের পাতে ভাত ঢেলে দেয় শোভনা।

সমীরণ বাধা দিতে পারে না। বিরক্ত হয়ে বলে, 'মেরে ফেলবে নাকি?'

নিজের ভাগের ঝোল-সুদ্ধ আধখানা মাছ ভেঙে সমীরণকে দেয় শোভনা। নিস্পৃহ ভঙ্গীতে বলে, 'খাও সমীরবাবু, খাও। খেতে খেতে গল্প কর আমার সঙ্গে।'

সমীবণ বলে, 'পারবো না, মরে যাবো খেলে।'

—'খেয়ে কেউ মরে না। না খেয়েই মরে। পঞ্চাশ সালে দেখোনি। কেন বাজে বকছো তবে?' হাঁড়ি থেকে ডালের বাটিতে ভাত তুলতে তুলতে কথা বলে শোভনা।

সমীরণ বসেই থাকে। শোভনা দেখে। শেষে অনুনয় করে যেন, 'কটা দিন একটু খেয়ে দেয়ে তাজা হয়ে নাও দেখি। তোমার চেহারাখানা কখনো আয়নায় দেখেছো? ঐ চেহারা দেখে কেউ চাকরী দেবে না তোমাকে।'

সমীরণ এইবার হেসে ফেলে।

কিন্তু পরদিন সমীরণ জানা-শোনা কয়েকজনের কাছে যায়। কাজের

ভরসাও দেয় দুজন। অন্ততঃ অন্যদিনের মত নিরাশ হয়ে ঘরে ফেরে না আজ।

বিকেল বেলা ঘরে ফেরে সমীরণ। টের পেয়ে শোভনা আসে।

'তুমি আর খাবে না। এই কথাটা কেন বলে গেলে না আমায়?'

সমীরণ পেছন ফিরে শোভনার দিকে তাকায়। কিন্তু শোভনাকে দেখে আজ স্তম্ভিত হতে হয়। আশ্চর্য অভিভূত চোখে শোভনাকেই দেখে সমীরণ। শোভনার চোখে জল। মুখটা শুকনো। সমীরণ বলে, 'তুমি খাও নি?'

—'থাক, সস্তা সোহাগে আমার কাজ নেই।' শোভনা মুখখানা বিকৃত করে।

সমীরণ আর কথা বলতে পারে না। চেয়ে চেয়ে এক নতুন শোভনাকে দেখে আজ। শোভনার মনের একটা অনাবিষ্কৃত দরজা যেন খুলে গেছে এই মুহূর্তে। এবং শোভনার দিকে তাকিয়ে ইলাকে মনে পড়ে এখন। ছেলেমানুষী ওদের সহজাত। অভিমান যেন স্বভাব।

সমীরণ ধীরে ধীরে বলে, 'তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, এক বন্ধুর বাড়িতে খাওয়ার কথা ছিল আজ।,

—'এখন আর শুনিয়ে লাভ কি বল? বরং একটা মিথ্যাকে বাঁচাতে আরো পাঁচটা মিথ্যে কথা বলবে। আমি তোমাদের চিনি।' শোভনা বেরিয়ে যায়। আর ফেরে না

স্নান সেরে ঘরে ঢুকে অবাক হয় সমীরণ। টেবিলের উপর আলো জ্বেলে রেখেছে শোভনা। মেঝেয় খাবার ঢাকা। কিন্তু শোভনা নেই। ডেকে উত্তর পাওয়া যায় না।

পরদিন ভোরে। ঘুম থেকে উঠে টেবিলের উপরে টাকা কটা পেয়ে সমীরণ আশ্চর্য হয়। সকালে শোভনাই এসেছিল এঘরে। কিন্তু টাকা রেখে যাবার কারণ খুঁজে পায় না সমীরণ।

চা তৈরী করছিল শোভনা। সমীরণকে দেখে চোখ নামিয়ে নেয়।

কিছুই বলে না। যেন ইচ্ছে নেই আর কথা বলার। সমীরণ বলে, 'তুমিই টাকা রেখে এসেছিলে ?'

—'হ্যাঁ।' সংক্ষিপ্ত জবাব শোভনার।

—'কেন ?'

—'আমরা না মানলেও তুমি আমাদের ভাড়াটে ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পার না সমীরবাবু, আমি তা জানি।'

সমীর এবার আহত হয়। বলে, 'লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিলে শোভনাদি!' সামান্য অপরাধে আমি পর হয়ে গেলাম তোমার কাছে ? টাকা দিয়ে পাঁচিল তুলতে চাও আমাদের সম্পর্কের মাঝখানে ? রইল তবে বাড়ি ঘর। চাইনে আমার টাকা।' শোভনার পায়ের কাছে দলা পাকানো কাগজের নোটগুলি ছুঁড়ে ফেলে সমীরণ।

শোভনা আর কথা বলে না। নিঃশব্দে চায়ের কাপটা এগিয়ে দেয় সমীরণের দিকে। সমীরণ চা খায় না। শোভনার এই নিষ্ঠুর আচরণে ব্যথা পেয়ে ফিরে যায়।

পাথর হয়ে বসে থাকে শোভনা। সমীরণের অমন করে চলে যাওয়া তাকে দ্বিগুণ করে বাজে। কাল বিকেল থেকে এক মুহূর্ত আগে পর্যন্ত তার সমস্ত আচরণের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রয়াস খুঁজে পেয়ে শোভনার এইবার নিজের উপরেই অপরিসীম রাগে মনটা ভরে ওঠে। সমীরণের· প্রত্যাখানটুকুও আর কঠোর মনে হয় না এখন। চা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে শোভনার। চোখ দুটো কড় কড় করে আঁচলে মুখ ঢাকে শোভনা।

সারাদিনে আর দেখা হয় না। কেউ কারো কাছে আসে না। ইচ্ছে থাকলেও শোভনার সাহস নেই। হয়তো ইহজীবনে আর কোনদিন সমীরণকে মুখ দেখানো যাবে না। শোভনা পারবে না দেখাতে। শোভনা তাই সংসারের অতি তুচ্ছ কাজেও আজ গভীর ভাবে মনোনিবেশ করতে চায়। কিন্তু পারে না। বুকের মধ্যে এক অপরিচিত যন্ত্রণা তাকে সারাদিন অস্থির করে রাখে। কোন কাজেই মন আর বসে না আজ। শোভনা

অনেক বার সমীরণের ঘরের বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার নীরবে ফিরে এসেছে।

সেদিনের মত সমীরণ উনোনে আঁচ দিয়েছিল আজ। কিন্তু রান্না আর হয়নি। দোকান থেকে পাউরুটি কিনে এনে খেয়েছে। সারাদিন দরজা জানালা বন্ধ করে ঘুমিয়েছে। তারপর বিকেলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেছে বাইরে। অন্যদিনের মত শোভনাকেও ডাকেনি। শোভনা বুঝি ভেবেছিল ডাকবে। তাই অনেক আশা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু সমীরণ ফিরেও তাকায়নি আজ। শোভনা আহত হয়ে ফিরে গেছে।

রাত্রে খেতে বসে বিপিন জিগ্‌গেস করে, 'সমীর খেয়েছে?'

—'সে আর খাবে না।' অন্যমনস্কের মত উত্তর করে শোভনা।

—'তার মানে?' ভাতের থালা থেকে হাত গুটিয়ে নেয় বিপিন। যেন গর্জন করে ওঠে।

—'আমিই বারণ করেছি।' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে উত্তর করে শোভনা।

বিপিন আর কথা বলে না। ভাত ফেলে উঠে যায়। কাঠ হয়ে বসে থাকে শোভনা।

সমীরণ ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমটা ভেঙে যায় হঠাৎ। বাইরে থেকে বন্ধ দরজায় লাথি মারছে কে। সাড়া না পেলে হয়তো দরজা ভেঙ্গে এখুনি ঢুকে পড়বে ঘরে। সমীরণ প্রথমে ভয় পায়। শেষে বিরক্ত হয়ে জিগ্‌গেস করে, 'কে?'

—'দরজা খোল।' বিপিনের গলা।

সমীরণ দরজা খোলে।

বিপিন বলে, 'কি করছিলে ঘরে?' বিপিন আজ রেগেছে। স্বরটা ওর ক্রুদ্ধ। সমীরণ টের পায়। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বিপিনকে লক্ষ্য করে। তারপর অতি সন্তর্পণে বলে, 'ঘুমিয়েছিলাম।'

—'খাওয়া হয়েছে?'

—'হ্যাঁ, হোটেল থেকে খেয়ে এসেছি।'

—'ব্যাস্ ব্যাস্ আর জানতে চাইনে।' রাগে চীৎকার করে ওঠে বিপিন। আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না। অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায় কোথায়।

ভোরবেলা শোভনা এসে ভেঙে পড়ে। বলে, 'তোমরা কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও?' শোভনার চোখে বাঁধ ভাঙা বন্যা।

বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকে সমীরণ। বলে, 'শোভনাদি সংসারে আমার আপন বলতে আজ আর কেউ নেই। মা মরে গেলেও আমি কাঁদিনি। তুমিই দাওনি কাঁদতে। কিন্তু কাল তুমি আমাকে অকারণ কাঁদালে। কাল সারা রাত ঘুমোতে পারিনি আমি। কেঁদেছি শুধু।'

শোভনা বলে, 'আমিও কেঁদেছি। অপরাধের সীমা নেই আমার। রাত্রে তোমার দাদা খায়নি কাল। রাগ করে কোথায় চলে গেছে। আমি এখন কী করবো?' ডুকরে কেঁদে ওঠে শোভনা।

সমীরণ শোভনার কাছে এগিয়ে যায়! হাতখানা জড়িয়ে ধরে বলে, 'ভাগ্যের দোষে আমি অনেক হারিয়েছি শোভনাদি। তোমাদের আর হারাতে পারবো না। তুমি কেঁদো না। কোথাও যায়নি বিপিনদা। আমি ডেকে আনছি।' সমীরণ দরজার দিকে এগিয়ে যায়। শোভনাও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে।

বাইরে এসে শোভনা বলে, 'জান সমীর, আমার জন্যে তোমার দাদার অশেষ দুঃখ। ভালবেসে আমাদের বিয়ে। কিন্তু জাতে ছোট বলে আমাকে নিয়ে তোমার দাদা সংসারে ঠাঁই পেলে না। তবু ভেবেছিলাম, ভালবেসেই একদিন সব জয় করবো। তা আর হল কই। এখন দেখছি জাতটা আমার ছোট বড় কিছু না। মনটাই ভয়ংকর নিচু হয়ে গেছে। নইলে তোমার দাদার মত মাটির মানুষকে আমি ক্ষেপিয়ে তুলি! তোমাকে কাঁদাই!'

সমীরণ এবার স্থান, কাল, পাত্র ভুলে যায়। দু'হাতে শোভনাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'শোভনাদি তুমি আমাকে মায়ের দুঃখ ভুলিয়েছো।

মন তোমার নিচু বললে কে! আমার কিছুই তোমাকে অদেয় নেই। এখন তোমার ভালবাসা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেবো আমি।'

ঠিক তখন। বাইরের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে বিপিন। সমীরণ আর শোভনাকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। হেসে বলে, 'তোমাদের ব্যাপার ঠিক বুঝি না। এত কান্না যে কেন কাঁদ!'

—'তোমাদের মত মানুষের হাতে পড়ে কান্না ছাড়া উপায় কি।' শোভনা কথা বলে এতক্ষণে!

—'তাহলে সমীর কেন কাঁদে?' বিপিন সমীরের দিকে তাকায়।

—'আমার কান্না দেখে। তোমার মত কি সবাই পাষাণ?'

বিপিন হাসে। 'কেমন জব্দ করেছি কাল বলতো?' বিপিন শোভনার দিকে তাকিয়ে থাকে।

শোভনা আর কথা বলে না। সমীরণকে নিয়ে ভেতরে চলে যায়। হতভম্বের মত উঠোনে একলা দাঁড়িয়ে থাকে বিপিন।

•

গায়ে যেন বিছুটি লাগে। সমীরণ পায়ে হাত দিতেই লাফিয়ে ওঠে শোভনা। সরে যায়। কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে যেন কাঁপে। বলে, 'নরকে পাঠাতে চাও আমাকে?'

সমীরণ হেসে জবাব দেয়, 'না, তোমাকে নরকে পাঠালে আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে যে।'

—'তবে পায়ে হাত দিচ্ছ যে বড়?'

—'তোমার আশীর্বাদ চাইছি শোভনাদি। তোমার আশীর্বাদ পেলে চাকরীটা আমার হয়ে যাবে।' সমীরণ এমন ভাবে কথা বলে, যেন শোভনার আশীর্বাদ একজন বাঘা মন্ত্রী কিম্বা এম, এল, এ-র হাতের কড়া ক্যারেকটার সার্টিফিকেট।' তার চাকরীর সবচেয়ে বড় সুপারিশ।

শোভনা বলে, 'তাই বলে পায়ে হাত দেবে তুমি?'

সমীরণ আর কথা না বলে আদুরে ছেলের মত মাথাটা শোভনার কোলে গুঁজে দেয়। শোভনা সমীরণের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে

বলে, 'চিরদিন কি বেকার বসে থাকে কেউ। চাকরী এবার হয়ে যাবে তোমার। কিন্তু একটা কথা।' একমুহূর্ত থামে শোভনা।

সমীরণ মুখ তুলে তাকায়। বলে, 'কি?'

—'চাকরী পেলেই একটা বিয়ে করবে এবার। নইলে তোমাকে দেখার কেউ নেই।'

—'কেন তুমি, তুমি কোথায় যাবে শোভানাদি?'

—'বোকা ছেলে!' শোভনা হাসে। বলে, 'আমি কি চিরদিন একভাবেই থাকবো। অসুখ বিসুখ হতে নেই আমার? মরতে নেই বুঝি?' শোভনার চোখ ছল ছলিয়ে ওঠে। সমীরণ শোভনাকে দেখে। এবং আজকেই যেন শোভনাকে প্রথম দেখছে সমীরণ। শোভনা আগের চেয়ে অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে। কেমন রুক্ষ হয়েছে দেখতে। বিপিন বুঝি লক্ষ্য করে না এসব। লোকটা বড্ড খেয়ালি। বড্ড উদাসীন বিপিন। অবশ্য ডাক্তার একদিন দেখে গেছে শোভনাকে। ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা দিয়ে চলে গেছে। শোভনাকে চেঞ্জে পাঠানোর কথা বলেছিল ডাক্তার। বিপিন সে সব কথা শুনেছে কিনা কে জানে! শোভনার জন্য কোন ওষুধই আসেনি। ডাল ভাতের নিয়ম বদলে কোন নতুন পথ্যেরও আমদানি হয়নি। বিপিন যেন কি! আগের চেয়ে নির্জীব মনে হয় বিপিনকে। কারো সঙ্গেই আর কথা বলে না পারত পক্ষে। চোরের মত আসে যায়। মুখ দেখে রাগ করার সাধ জাগে না। মায়া হয় লোকটার উপর।

আবার কথা বলে শোভনা, 'সত্যি সমীর, একটা বিয়ে কর তুমি। মরার আগে তোমার বউয়ের হাতের সেবা শুশ্রূষা পাবো ক'দিন। তোমরা ছাড়া আর কেই বা আছে আমার।' শোভনার কথাগুলি কান্নায় ভেজা। শোভনার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, ওর বুকে বড় ব্যথা। ঠিক ইলার মতই গভীর এক অসুখ শোভনার মনে। ইলার মতই সংসারে আপন বলতে কেউ নেই শোভনার

শোভনার কথা শুনে বিপদনাশিনীকে মনে পড়ে। মরার আগে

বিপদনাশিনীও এমন করেই কথা বলতেন। বড় আশা ছিল বিপদনাশিনীর ছেলের বউ দেখার। একদিন ইলাকে দেখে তাই মুগ্ধ হয়েছিলেন।

সমীরণ বলে, 'শোভনাদি তুমি মরতে চাও কেন? আমি তোমাকে মরতে দেবনা।'

শুকনো হাসি হেসে বলে শোভনা, 'যম তোমার কেনা গোলাম কিনা!'

কিন্তু সমীরণ যা ভাবেনি তাই হল। শোভনাও খুশি না হয়ে পারে না। এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটারটা এসেছে আজ। চাকরীটা হয়ে গেল সমীরণের। হাতে পনের দিন সময় আছে আর। তারপরে চলে যেতে হবে। দূরে, অনেক দূরে চলে যাবে সমীরণ। আন্দামানে।

সন্ধ্যের পরে ঘরে ফেরে সমীরণ। এক গা জ্বর নিয়ে শোভনা এসে আলো জ্বলিয়ে দিয়ে যায়। বলে, 'তোমার দুটো চিঠি এসেছে সমীর। একটাতে বোধ হয় টাকা আছে। আমি খুলিনি।'

সমীরণ আশ্চর্য হয়ে বলে, 'টাকা! টাকা পাঠাবে কে?'

শোভনা বলে, 'তা তো জানিনে। খুলে দেখো।'

শোভনা চিঠি দুটো সমীরণের হাতে দেয়। বলে, 'রাত্রে আর আমি উঠতে পারবো না সমীর। জ্বর এসেছে খুব। রান্না করে রেখেছি। তোমার দাদা এলে, নিয়ে খেও।' দাঁড়াতে পারে না শোভনা কাঁপতে কাঁপতে চলে যায়।

সমীরণ আলোর কাছে এগিয়ে আসে। পোষ্টকার্ডের চিঠিটা পড়ে আগে। মামা লিখেছে। বিপদনাশিনীর মৃত্যু সংবাদে মর্মাহত হয়ে চিঠি লিখেছেন তাঁর ভাই। একবার চোখ বুলিয়েই চিঠিটা রেখে দেয় সমীরণ।

ইনসিওর করা চিঠি খোলে এবার। প্রথমেই তিনখানা দশ টাকার নোট। তারপর দীর্ঘ চিঠি। কণিকা সেন লিখেছেন সমীরণকে। আলোটা সামনে টেনে নেয় সমীরণ। ভাঁজ খুলে চিঠিটা পড়তে শুরু করে! চিঠিটা অনেক দিন আগে লেখা। অন্ততঃ তারিখটা দূরের। অনেক পথ ঘুরে ঘুরে সমীরণের হাতে এসেছে আজ।

'এইমাত্র চলে গেল ওরা। ওরা কোথায় গেল কে জানে।

সমীরণ, আমি কণিকা সেন। ইলার মা আমি। তোমাকে চিঠি না লিখে পারলুম না।

এইমাত্র টের পেলুম মাথাটা বেজায় ধরেছে। কিন্তু এখন না। সেই দিন থেকেই মাথার ভেতরে এই যন্ত্রণাটাকে পুষে বেড়াচ্ছি আমি। যেদিন তুমি এখান থেকে চিরদিনের মত চলে গেলে। তাই বা কেমন করে বলি। তুমি তো যাওনি। আমিই তাড়িয়ে দিয়েছিলুম তোমাকে। বাঁচিয়ে দিয়েছিলুম। সেদিন থেকেই মনের অবচেতন অন্ধকারে লাই দিতে শুরু করেছি এই যন্ত্রণাকে। আজ যা ধরা পড়ল এই মুহূর্তে। সামনে এ একটা বোধ। যন্ত্রণা-বোধ আমাদের। সব অসুখই মনের। দেহের কোন সুখ নেই। অসুখও না। কথাটা এইমাত্র মনে হল সত্যি। ওরা যখন চলে গেল। আর মাথার যন্ত্রণাটা যখন ধরা পড়ল আমার কাছে।

এই চিঠি লিখে আমি শোব। নইলে বাঁচবো না। মাথাটা ছিঁড়ে পড়তে চাইছে এখন। কিন্তু তার আগে তোমাকে সব কথা বলতে হবে চিঠিটা শেষ না করে আমায় স্বস্তি নেই।

সমীরণ, সেন সাহেবকে তুমি যা ভাবো, তিনি তাই। কিন্তু আমাকে যা ভাবো, আমি তা নই। কিন্তু এই কথাটা কেমন করে বোঝাই তোমাকে? কেমন করে বিশ্বাস করাবো? অথচ তোমার মনের ভুলটুকু শুধরে দেবার জন্যেই তো আজ এই চিঠি লেখা।

সব কথা মনে নেই। অন্তত বলার মত মনের অবস্থা নেই আর। অথচ বলতেই হবে তোমাকে। না বলে শান্তি নেই আমার। পৃথিবীতে একজনকে হলেও আমি জানাতে চাই, আমি যা, তা নই। অর্থাৎ চিরদিনই এমন ছিলুম না আমি।

মাস্টার, আমার বাবা ছিলেন গোঁড়া বামুন পণ্ডিত। ভাষার সঙ্গে সায়েবদের খানা খাবারের প্রবেশ পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল আমাদের পরিবারে। এ হেন সংসারের মেয়ে আমি। বাবার কাছে সংস্কৃত

শিখেছিলুম ছেলেবেলায়। আদ্য-মধ্য পাশ করেছিলুম। বাবার বড় সাধ ছিল আমাকে ন্যায় পড়াবেন। দিন-রাত কত স্বপ্নই না দেখতুম তখন। মনের মধ্যে গার্গী-লীলাবতী-খনার আদর্শ। ভেবেছিলুম, এমনি করেই দিন কেটে যাবে। কিন্তু কই গেল না তো।

আমাদের বাড়িতে একজন নতুন মানুষ এল। পুরুষ মানুষ। যেমন রূপ, তেমনি তার গুণ। ইংরেজী জানা দিবাকর সংস্কৃত পড়তে এল বাবার কাছে। সবে ষোল বছর বয়স আমার। সমবয়সী মেয়েদের জানি, এ সময়ে মনের দিক থেকে হাস্যকর রকমে লাজুক হয় তারা। দেহের দিক থেকে অস্বাভাবিক সচেতন। হয়তো আমিও তাই ছিলুম। কিন্তু তর্ক করা আমার চিরদিনের স্বভাব। বাবার সামনে পড়তে বসে তর্ক জুড়ে দিতুম দিবাকরের সঙ্গে। হেরে গিয়েও খুশির অন্ত ছিল না আমার। কিন্তু এই খুশির মানে জানা ছিল না। যখন জানলুম, তখন বিয়ে না করে উপায় ছিল না দিবাকরকে। আমি আশ্চর্য হলুম। দেখলুম বাবার অমত নেই এ বিয়েতে। সুতরাং বিয়ে হয়ে গেল আমাদের।

মাস্টার, তুমি ভাগ্য মানো? আমি মানি।

সুখ আমার সইল না। ইলার জন্মের আগেই বাবাকে হারাল মেয়েটা? আমি কিন্তু জেনেছিলুম মা হবার পরে। খবরটা চেপে রেখেছিল সবাই। দৈনিকের পাতায় টুকরো টুকরো বিমানের ছবিটা দেখেছিলুম। কিন্তু কেমন করে জানবো, বিমানের সঙ্গে আমার কপালও অমনি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেচে। আমি বুঝিনি। যখন বুঝলুম, তখন কান্নার সময় নয় আমার। আমাকে নিয়েই যমে মানুষে টানাটানি শুরু হয়েছে তখন। এক মেয়ের জন্ম দিয়েই অসাড় হয়ে পড়েছি আমি।

বাবা মরেছিলেন তার পরের বছরে। তখন থেকেই সংসারে একটি মাত্র মেয়েকে নিয়ে আমি একলা। সহায় বলতে কিছু নেই আমার। শুনেছিলুম উত্তরবঙ্গে আমার শ্বশুরের ভিটে আছে কোথায়। এক দূর

সম্পর্কের বিধবা শাশুরী থাকেন সেখানে। আমার স্বামী কিন্তু কখনো যাননি দেশে। ইচ্ছে হলে, মেয়ের হাত ধরে যেতে পারতুম আমি। তবু গেলাম না। ঐটুকু মেয়ের ভবিষ্যৎ ভাবলুম। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নিরস্ত হলুম আমি। ও যে আমার কত বড় আশা! কেমন করে বোঝাবো তা! তোমার তো ছেলে মেয়ে নেই মাষ্টার!

বাবার কাছ থেকে যা যা শিখেছিলুম, ভগবৎ বিশ্বাস তাদের একটি। আত্ম-প্রত্যয়ের শক্তিও সঞ্চয় করেছি বাবার চরিত্র থেকে। তাই শত দুঃখেও ভেঙে পড়িনি। কখনো নিরাশ হইনি জীবনে। আমার জীবনে তাই মোড় ফেরার লগ্ন এল। দিক বদলের দিন। মেয়ের হাত ধরে পথে পথে ঘোরার চেয়ে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার পথ খুঁজছিলুম আমি। সে পথ মিলে গেলে। মিলিয়ে দিলেন বাবার আরেক ছাত্র সুধাময়। ট্রেনিং সেরে হাসপাতালে কাজ নিলুম নার্সের। অনেক টাকার লোভে অনেক দূরে চলে গেলুম। বাংলা ছেড়ে আসাম। ইলা রইল কলকাতায়। আমার আশা ইলা। বিকেল বয়সের একমাত্র ভরসা। মিশনারিদের হষ্টেলে থাকে ও। স্কুলে পড়ে। আমি টাকা পাঠাই মাসে মাসে। ছুটি পেলেই দেখে যাই। কিন্তু সেই দেখাও বন্ধ করতে হল আমাকে।

কেমন করে সে কথা লিখি? সে যে নিন্দার কথা! আমার কলংক!

তবু না লিখে উপায় নেই। স্বস্তি নেই। মুক্তি নেই আমার। তোমাকে সব কথা লিখে আজ আমি ভারমুক্ত হতে চাইছি, মাষ্টার। এ বোঝা আর যে বইতে পারিনে আমি। জ্বালা আর সইতে পারিনে। হয়তো এর পরে আর তোমাকে মুখ দেখানো যাবে না। প্রয়োজন হবে না তার। সুযোগও না। লেখার একমাত্র ভরসা এইটুকু।

জান মাষ্টার, বামুন-পণ্ডিতের মেয়ে কণিকার নতুন করে কপাল ভাঙল ফের। তাই বা কী করে বলি। বরং বলা ভালো, নতুন করে গতি পেল জীবন। ভিন্ন পথে বাঁক নিল। ভুলে গেলুম আমার সমাজ। আমার সংসার। ইলার কথাও মনে পড়ল না একবার। আমাকে গ্রাস করল আমার লোভ। নইলে ক্যাপ্টেন সেনের মত একটা ইন্দ্রিয়-

সর্বস্ব মানুষের খেয়ালে মেতে উঠবার মত মেয়ে তো ছিলুম না আমি! আজ অবাক হই ভেবে। আবার অবাক হবারই বা কী আছে এতে? আমি তো মানুষ। তার উপরে মেয়েমানুষ। অল্প বয়সে বিধবা। স্বামীর সঙ্গে যার পুরো একটি বছরও ঘর করা হয়নি। প্রেমের পালা জমতে, না জমতেই শেষ হয়ে গেছে যার জীবন। তৃষ্ণা তার মনে থাকবে না তো, থাকবে কার? সংযমের বাধ বেঁধে অনেককে ঠেকানো যায়। কিন্তু সবাইকে না প্রবৃত্তি যে কারো অধীনই নয়। আমি তাই ক্যাপ্টেন সেনের মিষ্টি কথায় ভুলে গেলুম সব। ভাবলুম, এই আমার ভালবাসা।

কর্তৃপক্ষের কানে উঠল কথাটা। আনাচে কানচে গুন গুন। আমি বেপরোয়া হয়ে গেলুম আরো। ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিলুম চাকরীটা।

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ। স্বাধীন হচ্ছে দেশ। সেন সাহেবের সঙ্গে চলে এলুম বাংলা দেশে। তারপর সাত ঘাটের জল ঘেটে জুটলুম এসে এইখানে। সেন সাহেব তখন মানে মর্যাদায় আগের চেয়ে অনেক অনেক বড়। এবং আমিও।

মনে আমার ভয় ছিল অসংখ্য। মেয়েকে মুখ দেখাবার লজ্জা। কিন্তু অবাক করল ও। ও যেন খুশিই হয়েছে আমাদের দেখে। এই খুশির মানে বুঝেছিলুম পরে। সেন সাহেবের সঙ্গে বাসায় ফিরে আসতে আসতে কথাটা মনে পড়ল। ইলা এখন বড় হয়েছে। বেশ বড়। আমি চমকে উঠলুম। মনে মনে ভাবলুম, ও এখন বুঝতে শিখেছে সব। পরদিনই মধুর হাতে নতুন শাড়ি কিনে পাঠালুম আমি।

সেই শাড়ি পরেই ইলা এখানে এল। সেন সাহেব আর যেতে দিলেন না ওকে। সুতরাং থেকে গেল ইলা। আমার কাছেই।

এর পরে বুঝে সমঝে চলতে হয় আমাকে। মেয়ের কাছে মা হয়েই থাকতে হয়। আগের মত উদ্দাম হতে বাধে। কিন্তু সেন সাহেব কি এসব বোঝেন। মদের ঘোরে মেয়ের কাছেই তার মাকে জড়িয়ে ধরে একদিন চুমো খান। আমার মান বাঁচাতে ছুটে পালায় ইলা।

আমাদের শোবার ঘরে ইলা যায় না। আমিই বারণ করেছি যেতে। তোমাকেও ঢুকতে দিইনি সেদিন। বাইরে পায়ের শব্দ শুনে বেরিয়ে এসেছিলুম! দরজা আগলে দাঁড়িয়ে ছিলুম। হয়তো ভয় ছিল আমার মুখে। চোখে আতংক। ইলার চোখে ছিল ঘৃণা। তুমি দেখেছিলে কিনা জানিনে। কিন্তু ঘরে ঢুকলে তুমিও ইলার মতই হতে। হয়তো ওঘরের দেয়ালে আমার অসংখ্য আমিকে দেখে শিউরে উঠতে ভয়ে। কিন্তু বিশ্বাস কর, ওখানে আমি নেই। ওসবই সেন সাহেবের রুচির এক একটি স্বাক্ষর। আমি উপায়হীনা।

একদিন বলেছিলুম সেন সাহেবকে, 'ইলার কিন্তু পড়া লেখা কিছুই হচ্ছে না এখানে। ওকে হস্টেলেই পাঠিয়ে দাও।' মনে মনে আমি রেহাই পেতে চেয়েছিলুম লজ্জার হাত থেকে।

সন্দিগ্ধ চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী কথা যে পড়তে চাইলেন উনি জানিনে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'বাড়িতে মাস্টার রেখে দাও না। শুধু দু'জনে কি থাকা যায় আর। একটা ছেলেপিলে না থাকলে খালি খালি লাগে সব। ও চলে গেলে এখানে টিকতে পারবো না আমি।' সেন সাহেবের মুখখানা করুণ হল।

বড় ভাল লেগেছিল সেদিন এই কথাগুলি। এবং সেন সাহেবকেও মনে হয়েছিল ভাল। আর কেন যে লাজুক হয়ে উঠেছিলুম তখন, জানিনে। আমার মুখটা বুঝি অকারণ লাল হয়ে উঠেছিল। আমাকে পেয়ে বসেছিল প্রণয়ভীরু বাসর ঘরের লজ্জা। কিন্তু মনের মধ্যে একটা নতুন কথার গুনগুনানি টের পেয়েছিলুন। একটা আশার ঝিলিক খেলে গিয়েছিল বুকে। আমি কথা বলতে পারিনি আর। খুশিতে পাগল হয়ে বাথরুমে পালিয়ে গিয়েছিলুম। খিল তুলে দিয়েছিলুম দরজায়। আমার বয়সের নৌকো তখন তিরিশের তীর ছুঁয়েছে সবে।

আমি যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেলুম কেমন হালকা। মানুষের চোখে হাস্যকর হয়ে উঠলুম দিনকে দিন। একটা ভঙ্গী। তবু সেন সাহেবের প্রয়োজনে আমি নিজেকে উজার করে দিলুম। তাকে খুশি

করাই যে আমার কাজ এখন। দিন রাত্রির ধ্যান জ্ঞান। কিন্তু কিসের আশায় তা ছেলের বয়সী তোমাকে কেমন করে লিখি?

সেন সাহেবর ওপরওয়ালাদের কাছে যেতুম। বিপদে পড়লে সেন সাহেবকে উদ্ধার করতে হয় যে আমাকেই। আমি ছাড়া আর কে-ই বা আছে তাঁর। আমি যে পুরুষের চোখে ধাঁধা। সেন সাহেব তা জানতেন। তাই আমার এই দেহটার যথাযোগ্য ব্যবহারে তাঁর কার্পন্য ছিল না কোথাও। মাস্টার, মেয়েদের কাল বুঝি তাদের দেহ আর যৌবন। এই দুটো না থাকলে তাদের আদর হত না সংসারে। অথচ রূপ আর যৌবনই একদিন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে তাদের।

লিখতে যখন বসেছি, সব কথাই লিখবো আজ। লজ্জা আর রাখবো না।

সেন সাহেবের সঙ্গে তাঁর বন্ধুদের আড্ডায় যেতুম। ওপরওয়ালদের কাছে যেতুম তাঁর পদোন্নতির সুপারিশ নিয়ে। উপঢৌকন ছিল আমার দেহ। এই যৌবন। এক একদিন মদে চুর হয়ে ফিরতুম বাসায়। অবশ্য আমার দেহের দেবতাটি পাশেই থাকতেন। তাঁরও অবস্থা মত্ত।

মাঝে মাঝে ক্লান্তি বোধ করেছি। মনে মনে অনুশোচনা। ভেবেছি, পালিয়ে যাই কোথাও। কিন্তু পারিনি। এ যেন এক নেশা। আমি যেন সেই পাখি। একবার খাঁচার দরজা খুলে আকাশের ঠিকানা দিলেও কোথাও যাবে না। আফিংয়ের নেশার টানে এইখানেই ফিরে আসবো ঠিক।

মেয়ের কাছে তাই সভ্য হতে চেয়েছিলুম। আগের থেকে আরেকটু শালীন। চালাকি করে একদিন তাই তোমাদের বাড়িতেই পাঠিয়েছিলুম ওকে। অবাক হয়েছিলে তুমি, জানি। কিন্তু উপায় ছিল না। আমি যে ইলার মা। মা হয়ে মেয়ের কাছে আর কত নগ্ন হব? ইলা আমার বুদ্ধিমতী মেয়ে। সব জেনে শুনে আমাকে ঘৃণা করতে শিখেছে। মেয়ে আমার বড় হয়েছে এখন।

পোষা বেড়ালের মত অষ্টপ্রহর আমার পায়ে পায়ে ঘুরত বিজয়। সেন সাহেবের একমাত্র ছেলে। আমরা এখানে এলে ও চলে এল মায়ের

কাছ থেকে। আর ফিরে গেল না। ইলা আমাকে ভুল বুঝল। নূতন করে সন্দেহ করল। তা করবে না কেন? আমি যদি ইলা হতুম হয়তো আমার মনও অমনি হত তখন। কিন্তু বিশ্বাস কর, বিজয় বাপের ছেলে। আমি ওকে ভয় করতুম। ঘৃণা করতুম। এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতুম সর্বক্ষণ। আবার মায়াও হত অসুস্থ, অকর্মন্য ছেলেটার উপর। একটুখানি করুণা পেলে কৃতার্থ হয়ে যেতো বিজয়। ইলার সন্দেহ ঘোচেনি। আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিল। বিজয় ছিল ওর দু'চোখের বিষ।

আশা তবু মরে না। ইলাকে ঘিরে এখনো অনেক সাধ, অনেক স্বপ্ন আমার জীবিত। ইলাকে বড় করে তোলার ইচ্ছাটা যেন মরে না।

একদিন ভয় পেলুম। যেদিন মধুর বউ এসে কেঁদে পড়ল আমার কাছে সেদিন চমকে উঠলুম আমি। সেন সাহেবকে সেইদিন থেকেই সত্যিকারের ঘৃণা করতে শিখলুম আমি। বুঝলুম এই পরিবেশে ইলাকে আর এক মুহূর্তও রাখা যায় না, হস্টেলেই পাঠাবো ঠিক করলুম। দিন তিনেক পরেই বউকে দেশে রেখে এল মধু। কিন্তু ইলাকে আর কোথাও রাখা হল না। কোথা থেকে তুমি এলে। সেন সাহেবই জুটিয়ে নিয়ে এলেন তোমাকে, সত্যি কথাই মাষ্টার, সেদিন তোমাকেও ভাল লাগেনি আমার।

কিন্তু আমার সর্বনাশ যে তার আগেই হয়ে গেছে মেয়ে হয়েও আমি তা বুঝিনি। আমি চিরকাল এমনি বোকা। এমন করেই ঠকেছি বার বার। এবং এবারেও।

মাষ্টার, আমার বড় সাধ ছিল। ইলাকে ঘিরেই শালীন এক কামনা। তাই যে পাপচক্রে অহরহ ঘুরে ঘুরে আমি ক্লান্ত, ইলাকে সেখান থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছি। ও যে আমার ভবিষ্যৎ। অসময়ের সম্বল। দিগন্তের অন্ধকারে আমার মাটির ঘরের প্রদীপ। আমার পাড়ে যাবার কানাকড়ি। ইলা আমার আশা। আমি তাই ওকে ফেলে যাই না। নাওয়া খাওয়া ভুলে বিছানার পাশেই

বসে থাকি রাতদিন। বুকের মধ্যে সে যেন এক দুরন্ত ঝড়ের ক্ষেপামি। আমার আশার নৌকো ডুবু ডুবু। আমি তাই যাইনে কোথাও। ভরসা পাইনে। তিনদিন পরে চেতনা ফিরে পেল মেয়ে। অকূলে কূল পেলুম আমি। আবার নাওয়া খাওয়ার কথা মনে পড়ল। আমি উঠে দাঁড়ালুম। সেন সাহেব ছিলেন পাশেই। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'তুমি যাও, কণা। নেয়ে খেয়ে ঘুমোও একটু। এখন তো কোন ভয় নেই আর। আমি ওর পাশে আছি।' সেন সাহেবের কথায় আগ্রহ আর সহানুভূতির রেশ। আমি খুশি হলুম। হাতে পায়ে খিল ধরা ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে টেনে বাইরে এলুম।

খাওয়ার পরে ঢলে পড়লুম। কাল ঘুমে জড়িয়ে এল চোখ। জেগে চোখ চাইলুম। বাইরে তখনও ছায়া ভরা বিকেল। পাখিদের স্তিমিত কলহে দূরে আম-জামের শান্ত জটলায় শাখায় পাতায় হাওয়ার দু'একটি ফিস্ ফিস। অদূরে অন্ধকারের ফ্রেমে বাঁধানো পুকুরের আয়নায় মুখ দেখছে রূপসা আকাশ। কপালে জ্বল জ্বল করছে সন্ধ্যা-তারার টীপ। আমি ইলার ঘরে গেলুম। অন্ধকারে কিছুই বোঝা গেল না। দেখা গেল না কাউকে। শুধু ইলার দু'একটা কাতর গোঙানি এল কানে। সুইসটা টিপে দিলুম। একরাশ আলোর ঢেউ খেলে গেল যেন। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে আলোর রেণু ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে। তারপর থিতিয়ে গেল সব। চারদিকে তাকালুম। সেন সাহেবকে দেখতে পেলুম না কোথাও।' ইলার কাছে এগিয়ে গেলুম। খসে পড়া শাড়ীটা চারপাশে তাকিয়ে জড়িয়ে দিলুম শরীরে। দেখলুম, কিসের খোঁচা লেগে বাঁ পাশের গালটা ফুলে উঠেছে বেশ। লাল হয়ে উঠেছে জায়গাটা। সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে চাইলুম জায়গাটায়। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ইলা। সে কান্না সারারাত একবারও থামেনি আর। আমি হতচেতন হয়ে বসে রইলুম পাশে। বুঝতে পারলুম না কিছুই। সেন সাহেব কিন্তু আর একবারও এলেন না এ ঘরে। এতদিন সঙ্গে থেকেও ইলার যন্ত্রণার কোন হদিশ পেলুম না

আমি। আমি যখন পেলুম, এখন পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেছে আমার চোখের সামনে।

না জেনে ইলার প্রতি ঘৃণায় ভরে উঠেছে মনটা। রাগ হয়েছে। আবার মনে মনে বিচলিত হয়েছি আমি। আমি মা। ইলার মা আমি। শুধু করুণ চোখে চেয়ে দেখছি আমার অনেক আশায় লালিত ভবিষ্যতের কুৎসিত চেহারাটা। সেই বীভৎস রূপ দেখে শিউরে উঠেছি। মনে মনে নিঃশব্দ আর্তনাদ করেছি কেবল। ঘুম আর চোখে আসেনি। তবু মেয়েকে মুখ ফুটে জিগ্‌গেস করতে পারিনি কিছুই। শুধু সন্দেহ করেছি একে, ওকে, তাকে। মনটা আমার ছোট হয়ে গেছে দিন দিন। অসহ্য লেগেছে বিজয়কে। চিরকুমার মিঃ উকিলকে মনে হয়েছে একটা পাপ। তখনো ভগবান দাসের চোখের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছি মেয়েকে। শুধু সেন সাহেব কাছে এলেই চোখে আগুন দেখেছি ইলার। আমি আশ্চর্য হয়েছি দেখে।

নিরুপায় হয়ে সেন সাহেবকে বললুম কথাটা। নিরুত্তর বেরিয়ে গেলেন সেন সাহেব। মধুর কাছে তোমাকে বসতে বলে চলে গেলেন। রাত্রে বৃষ্টি নামল। তুমি বসে রইলে। অনেকক্ষণ পরে মাতাল হয়ে ফিরে এলেন সেন সাহেব। তোমার কাছে গেলেন না। সারারাত বসে রইলে তুমি। বাইরে বৃষ্টি ছিল সে রাত্রে। ঝড়।

সেন সাহেব বিছানায় গেলেন না। ঘুমোলেন না সে রাত্রে। অনেকক্ষণ ধরে পায়চারি করলেন। ঘর বার করলেন খালি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি সব দেখলুম। দেখে ভয় পেলুম। এক সময় অবাক হলুম। চাবুকটা হাতে করে বেরিয়ে গেলেন সেন সাহেব। কোথায় গেলেন কে জানেন।

তার একটু পরেই। বিজয়ের চিৎকার কানে এল। ছুটে গেলুম। কিন্তু নিরাশ হতে হল। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। খিল তুলে দিয়েছেন সেন সাহেব নিজে। অসহায় ভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে চাবুকের সপাসপ শব্দ শুনছি। আর বিজয়ের কান্না। থর থর করে কাঁপছি আমি।

আমারও কান্না পাচ্ছিল তখন। কিন্তু কি করবো আমি? আমি যে নিরুপায়। শত ডাকাডাকিতেও সাড়া দেবেন না সেন সাহেব।

পাশের ঘরে ইলা কাঁদছে। কখন জেগে উঠেছে ইলা। তখন কিন্তু মেয়েটাকে ভীষণ খারাপ লেগেছিল আমার। সেন সাহেবকে মনে হয়েছিল ভাল। মনে মনে এক পাশবিক উল্লাস জেগেছিল, ইচ্ছে হয়েছিল একবার দুই চোখে হৃদয়ের পরিপূর্ণ আনন্দ নিয়ে বিজয়ের দশাটুকু উপভোগ করি। কিন্তু বিজয় যখন বাইরে এল তখন আর তাকাতে পারেনি। অমন দগদগে বীভৎস দেহটা দেখা যায় না। আমি ভয় পেলুম। তখন কেন জানিনে, অসুস্থ, অকর্মণ্য ছেলেটার দশা দেখে বুকের ভেতরে টনটনিয়ে উঠল ব্যথা। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল জলে! ইলা ছুটে এল বাইরে। কেঁদে আকুল হল ইলা। কিছু বুঝলুল না। কী বলতে চায় মেয়েটা! ওর মুখের দিকে তাকালুম। রাগ হল। ঘৃণায় রিরি করে উঠল শরীর। মনে হল, আর কেউ না, ইলাই সর্বনাশ করেছে নিজের। মুখখানা বিকৃত করে চেঁচিয়ে উঠলুম আমি। বললুম, 'মুখ তো পুড়িয়েছো। আবার সঙ দেখাতে এলে কেন এখানে। যেখানে ছিলে সেখানেই মরগে, যাও!' মাস্টার জীবনে সেই প্রথম ইলাকে রাগ করলুম আমি। ইলা যেন মন্ত্র বলে মিইয়ে গেল। আস্তে আস্তে ঘরে ফিরে গেল ইলা।

সেন সাহেব ভ্রূক্ষেপ করেন নি কিছুই। চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে পেছনের দরজা খুলে বিজয়কে বের করে দিয়েছিলেন। লাথি খেয়ে চৌকাটের ওপাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল বিজয়। সেন সাহেব ফিরে তাকালেন না। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। নিঃশব্দে ফিরে এলেন ঘরে। তাঁর দিকে তাকাতে পারিনে। চোখের তারা দুটো যেন জ্বলছে। ভয়টা আবার দুলে উঠল বুকে। আমার কান্না পেল আবার।

তারপর ভোর বেলা। ঝড় তখন থেমে এসেছে। বৃষ্টিও। সেন সাহেব তোমার কাছে গেলেন। তারপর সবই তোমার জানা। আমি

তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম। বাঁচিয়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু তারপর? এই তারপরে অধ্যায়টুকুই ভয়াবহ, মাষ্টার। শোবার ঘরের দরজা ইলা আর ইহজীবনে খুলল না। দরজা ভেঙ্গে যখন ঘরে ঢুকল সবাই, ইলা তখন নেই। সেন সাহেবের দেওয়া বিষ খেয়েই মরেছে ইলা। কারণ দিন কয়েক আগে সেন সাহেবের হাতেই ছোট্ট নীল শিশিটা দেখেছিলুম। আর শুনেছিলুম কথাটা, জিবের ডগায় একটুখানি ছোঁয়ালেই নাকি মৃত্যু। মরণের এমন উপাদেয় ওষুধ নাকি নেই আর।

এখন রাত হয়েছে বেশ। ওরা চলে গেছে এই মাত্র। সারাদিন ইলার দেহটাকে ঘিরে এখানেই ছিল সবাই। থানা থেকে দারোগা পুলিশ এসেছিল তদন্তে। সেই সকালেই পুড়িয়ে ফেলা যেতো ইলাকে। সেন সাহেবের ইচ্ছে তাই ছিল। এবং আমারও। কারণ ঐ বীভৎস দেহটা আর চোখ মেলে দেখা যাচ্ছিল না। দেখতে পারছিলুম না আমি। তাই তাড়াতাড়ি চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিলুম ওকে। কিন্তু বাধা দিলেন মিঃ উকিল! সেন সাহেবের সঙ্গে আজ হেসে কথা বললেন না। তাকালেন না একবার। সেন সাহেবের চোখে বুঝি আগুন জ্বলে ওঠে। মিঃ উকিলকে যেন বিষ নজরে দেখছেন সেন সাহেব। মিঃ উকিল ভ্রূক্ষেপ করলেন না। আড়ালে দাঁড়িয়ে দারোগাকে কী সব বলেন যেন। লোকটাকে আজ নতুন লাগছে। কেমন অচেনা। এই প্রথম সেন সাহেবের বন্ধুকে তাঁর থেকে আলাদা মনে হল আমার। দারোগা মিঃ উকিলের কথাই বুঝি রাখলেন। আর শ্মশানে নয়। অন্য কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে ইলাকে। ওর অমন সুন্দর দেহটাকে কেটে, ছিঁড়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হবে সেন সাহেবের অতি আদরের একটি বিন্দু। গরলের কণিকা মাত্র।

এইমাত্র চলে গেল ওরা। এবং ইলাকে নিয়েই। ওরা কোথায় গেল কে জানে!

এখন অনেক রাত। আমি এই ঘরে একলা। কিছুক্ষণ আগেও

ইলা ছিল এই ঘরে। মাস্টার, আমি কাঁদিনি। আমি কাঁদবো না। এখন আবার সেন সাহেবের কাছেই যাবো। পাশের ঘরেই সেন সাহেব। তাঁর হাতের মদের গ্লাসের টুং টুং আওয়াজ পাচ্ছি। সেন সাহেব আমাকে ডাকছেন। আমি শুনতে পাচ্ছি। আমি এখন ওঘরেই যাবো। সেন সাহেবের হাত থেকে মদের গ্লাস কেড়ে নেবো। আজকেই প্রথম কথটা বলবো সেন সাহেবকে। একটি ভিক্ষে চাইব। যা কোন দিন চাইনি। চাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। কারণ ইলা ছিল আমার। আমার ভবিষ্যৎ ছিল। আমার আশা। আজ তাই সেন সাহেবকে কথাটি বলবো। শুধু বলা নয়, আমার প্রাপ্য বুঝে নেব আজ। আদায় করে নেবো।

আমার মাথাটা আবার ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। অসম্ভব জ্বালা করছে চোখ দুটোতে। লিখতে পারছিনে আর। খুঁজে পাচ্ছিনে কথা। তাই শেষ কথাটা বলি। ইলাকে মরতে বলেছিলুম আমি। সেন সাহেব তার অনেক আগেই ইলাকে মেরেছেন। কিন্তু তুমি, তুমিও কি আমার ইলাকে বাঁচাতে পারতে না, সমীরণ ?